বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. হায়াৎ মামুদ
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
মিলন রায়

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৬
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরের অষ্টম শ্রেণির জন্য **বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি** বইটি নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যাকরণ অংশে ভাষার উপাদান ও গঠনের বর্ণনা ছাড়াও চেষ্টা করা হয়েছে বাংলা ব্যাকরণের অতি সাম্প্রতিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর। নির্মিতি অংশ প্রমিত বাংলায় সৃজনশীলতার চর্চা এবং কার্যকর দৈনন্দিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি, 'বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি' বইটি শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.১	ভাষা	১
১.২	মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা	২
১.৩	সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য	৩
২.১	ধ্বনি ও বর্ণ	৯
২.২	ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ	১৪
৩.১	সন্ধি	১৬
৩.২	বিসর্গ সন্ধি	২১
৪.	শব্দ ও পদ	২৫
৪.১	লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ	২৬
৪.২	বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ	২৯
৪.৩	বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ	৩৩
৪.৪	নির্দেশক সর্বনামের রূপ	৩৬
৪.৫	ধাতু ও ক্রিয়াপদ	৩৮
৪.৬	সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া	৩৯
৪.৭	মৌলিক ও সাধিত ধাতু	৪০
৪.৮	ক্রিয়ার কাল	৪২
৫.	শব্দগঠন	৪৮
৫.১	ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈত	৪৮
৫.২	শব্দগঠন : প্রাথমিক ধারণা	৫২
৬.	বাক্য	৫৫
৬.১	বাক্যগঠনের শর্ত	৫৬
৬.২	খণ্ড বাক্য, স্বাধীন ও অধীন খণ্ডবাক্য	৫৭
৬.৩	সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন	৫৮
৭.১	বিরামচিহ্ন	৬১
৭.২	কমা, সেমিকোলন, কোলন ও হাইফেনের ব্যবহার	৬২
৮.	বানান	৬৬
৮.১	বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম	৬৬
৯.	অভিধান	৭১

ক্রমিক নং	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৯.১	বর্ণানুক্রম	৭১
৯.২	ভুক্তি ও শীর্ষ শব্দ	৭২
১০.	শব্দার্থ	৭৪
১০.১	একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে বাক্য রচনা	৭৪
১০.২	সমার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা	৮১
১০.৩	বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা	৮৭
১০.৪	বাগ্‌ধারা	৮৮
	নির্মিতি	৯১
	সারাংশ ও সারমর্ম	৯৩
	ভাব-সম্প্রসারণ	৯৭
	পত্র রচনা : ব্যক্তিগত পত্র	১০২
	আবেদন পত্র	১০৬
	নিমন্ত্রণ পত্র	১১০
	প্রবন্ধ রচনা	
৫.১	বাংলাদেশের ষড়ঋতু	১১২
৫.২	বাংলা নববর্ষ	১১৪
৫.৩	বিজয় দিবস	১১৫
৫.৪	ট্রেনে ভ্রমণ	১১৭
৫.৫	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	১১৯
৫.৬	আমার ছেলেবেলা	১২২
৫.৭	বাংলাদেশের কৃষক	১২৩
৫.৮	দৈনন্দিন জীবন ও বিজ্ঞান	১২৫
৫.৯	ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১২৬
৫.১০	শ্রমের মর্যাদা	১২৮
৫.১১	পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা	১৩০
৫.১২	কর্মমুখী শিক্ষা	১৩১
৫.১৩	অধ্যবসায়	১৩৩
৫.১৪	স্বদেশ প্রেম	১৩৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাষা

১.১ ভাষা
১.২ মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা
১.৩ সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য
১.৪ কর্ম-অনুশীলন

১.১ ভাষা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার মনের মধ্যে সব সময়ই নানা বুদ্ধি বা ভাবের আনাগোনা চলে। সেই বুদ্ধি বা ভাব ইশারায়, নানা অঙ্গভঙ্গি করে, ছবি ও নাচের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু মুখের ধ্বনির সাহায্যে ব্যাপক পরিসরে তা প্রকাশ করা যায়। যেভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করা হোক না কেন, এর সবই ভাষা। তবে অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় মানুষের মুখের ধ্বনি অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হয় ও অন্যে বুঝতে পারে। সুতরাং সাধারণ কথায় 'ভাষা' বলতে বোঝায়, মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অর্থপূর্ণ কতকগুলো আওয়াজ বা ধ্বনির সমষ্টি। এই অর্থপূর্ণ ধ্বনিই হলো ভাষার প্রাণ।

ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট জনসমাজের মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ দিয়ে অন্যের বোধগম্য অর্থপূর্ণ যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে তাকে ভাষা বলে।

স্থান, কাল ও সমাজভেদে ভাষার রূপভেদ দেখা যায়।

ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে। মানুষের গলনালি, দাঁত, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, নাক ইত্যাদির সহযোগ হলো বাগ্‌যন্ত্র।

যেকোনো ধ্বনি বা আওয়াজই ভাষা নয়। সেখানে অর্থ এবং অর্থের ধারাবাহিকতা থাকা চাই। ধ্বনির অর্থপূর্ণ মিলনে গঠিত হয় শব্দ। আর একাধিক শব্দের সমন্বয়ে অর্থের ধারাবাহিকতায় তৈরি হয় বাক্য।

পশু–পাখির ডাক ও মানুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য এখানেই। মানুষ একের পর এক অর্থবোধক শব্দ জুড়ে বাক্য তৈরি করে। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে একের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করে। এই ক্ষমতা পশু-পাখির মধ্যে নেই। পশু-পাখি নানা আওয়াজ করে ঠিকই, কিন্তু তা ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের মতো কোনো বিষয় বা ধারণাকে ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট করতে পারে না। সে জন্য পশু–পাখির ডাক ভাষা নয়।

স্থান, কাল ও সমাজভেদে ভাষার রূপভেদ হয় বলে পৃথিবীর সব দেশের সব জনগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা এক নয়। আবার একই ভাষার এক হাজার বছর আগের রূপ আর আজকের রূপ হুবহু মেলে না। যেমন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা বাংলা, ইংল্যান্ডের মানুষের ভাষা ইংরেজি, ফ্রান্সের মানুষের ভাষা ফরাসি, চীন দেশের অধিকাংশ মানুষের ভাষা ম্যান্ডারিন ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশে বাংলার পাশাপাশি চাকমা জনগোষ্ঠী নিজস্ব চাংমা ভাষায়, গারো জনগোষ্ঠী তাদের আচিক ভাষায় কথা বলে। প্রায় পাঁচশো বছর আগের বাংলা ভাষা এবং আজকের বাংলা ভাষাও হুবহু এক নয়। সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে ভাষারূপের এই পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনশীলতার কারণে ভাষাকে প্রবহমান নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মনের ভাবকে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মানবসমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা রকমের শব্দ ব্যবহার করা হয়। এগুলোই একেক দেশে একেক রকম ভাষার জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো ভাষাই স্থির থাকে না। ভাষা স্থির হয়ে গেলে তা মৃতভাষায় পরিণত হয়। পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি ভাষা প্রচলিত আছে।

১.২ মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা

ক. মাতৃভাষা

মানুষ জন্মের পর সাধারণত প্রথমে তার মায়ের কাছে প্রতিপালিত হয়, তারই কথা শেখে। তাই জন্মলগ্ন থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ নিজের মায়ের কাছে যে-ভাষাটি শিক্ষা পায়, তাকেই তার 'মাতৃভাষা' বলে। এটি একটি ধারণার প্রকাশমাত্র। তাই যে শিশুর মা তার জন্ম-মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করে, সেই শিশু যখন বড় হয়, সে পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বড় হলেও তার মুখের সাধারণ ভাষাকে 'মাতৃভাষা'ই বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জন্মের পর মায়ের কোলে এবং মায়ের বাংলা বোলে বড় হয়। বাঙালি মায়ের এই বুলি বাংলা। তাই বাঙালি জাতির মাতৃভাষা বাংলা। আবার বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বাস করে। তাদেরও পৃথক মাতৃভাষা আছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড রাজ্য; মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য ইত্যাদি স্থানে বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে। এসব অঞ্চলে অনেকেরই মাতৃভাষা বাংলা। তা ছাড়াও যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের বহু দেশেই বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। সেসব স্থানেও বাংলা অনেকের মাতৃভাষা। পৃথিবীর প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষার বিবেচনায় সারা বিশ্বে বাংলা ভাষার স্থান ষষ্ঠ।

খ. রাষ্ট্রভাষা

রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো দেশের সংবিধানস্বীকৃত ভাষাকে ঐ দেশের রাষ্ট্রভাষা বলে। একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভাষার ব্যবহার থাকতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে বাংলা, চাংমা, আচিক, মণিপুরী ভাষা ইত্যাদি; ভারতে বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, কানাড়ি ভাষা ইত্যাদি; পাকিস্তানে পাঞ্জাবি, বালুচ, সিন্ধি ভাষা ইত্যাদি। এতে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাজ কোন ভাষাতে পরিচালিত হবে– এই প্রশ্ন আসে। এ প্রশ্ন সমাধানকল্পে কোনো কোনো রাষ্ট্র নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লিপিবন্ধ আছে : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

রাষ্ট্রের সর্বাধিক মানুষের বোধগম্য ভাষা হিসেবে সাধারণত রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ ভাষায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড, যেমন : শিক্ষাপ্রদান, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সাহিত্যরচনা, সংবাদপত্র প্রকাশ, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা, দলিল-দস্তাবেজ লিখন, রাষ্ট্রীয় নথিপত্র লিপিবন্ধকরণ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পাশে ইংরেজিকেও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানস্বীকৃত কোনো রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা না থাকলেও দাপ্তরিক কাজকর্মের ভাষা হিসেবে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজি স্বীকৃত। ভারতের রাজ্যগুলোতে প্রশাসনিক কর্মে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ব্যবহার হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ঝাড়খন্ড রাজ্য এবং আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা বাংলা।

১.৩ সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষারও একাধিক আলাদা রূপ আছে : একটি বলার ভাষা বা মৌখিক রূপ, অপরটি লেখার ভাষা বা লৈখিক রূপ। ভাষার মৌখিক রূপের আবার দুটো রীতি রয়েছে, যথা : আঞ্চলিক রীতি ও প্রমিত রীতি। অপর দিকে লৈখিক রূপেরও দুটো আলাদা রীতি আছে, যেমন : চলিত রীতি ও সাধু রীতি।

বাংলা ভাষার এ প্রকার বা রীতি-ভেদ নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো :

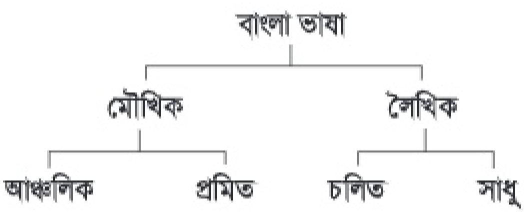

আঞ্চলিক ভাষারীতি : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠী মুখে মুখে যে ভাষারীতিতে মনোভাব ব্যক্ত করে সে ভাষারীতিই বাংলার 'আঞ্চলিক ভাষারীতি' নামে অভিহিত। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার প্রচলিত কথ্যরূপকেই আঞ্চলিক ভাষারীতি বলে।

২০২৫

যেমন– বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষারীতি: 'ঔগ্‌গোয়া মাইন্‌ষ্যের দুয়া পোয়া আছিল্‌।' অর্থাৎ একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। আঞ্চলিক ভাষাকে উপভাষা বলে। আঞ্চলিক ভাষায় শব্দের বহুবিচিত্র রূপ দেখা যায়। যেমন: 'ছেলে' শব্দটি অঞ্চলভেদে ছোয়াল, ছাওয়াল, ছাবাল, ছেইলে, পোলা, পোয়া, পুয়া, ব্যাটা, ব্যাডা, পুত, হুত ইত্যাদি উচ্চারিত হয়।

প্রমিত ভাষারীতি : বিভিন্ন ভাষারীতি কালক্রমে পরিমার্জিত হয়ে সবার গ্রহণযোগ্য একটি রূপ লাভ করে। এই ভাষারীতি সাধারণত শিক্ষিত লোকের কথাবার্তা ও নিত্য ব্যবহারে আরও আকর্ষণীয় হয়। ভাষাও যে শ্রমসাধ্য, প্রযত্নলব্ধ এবং শেখার কোনো বিষয়– প্রমিত ভাষারীতি তার প্রমাণ। এক কথায়, ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য ও সমকালের সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকেই প্রমিত ভাষারীতি বলে।
যেমন: 'একজনের দুটো ছেলে ছিল।'

সাধু ভাষারীতি : যে ভাষারীতি অধিকতর গাম্ভীর্যপূর্ণ, তৎসম শব্দবহুল, ক্রিয়াপদের রূপ প্রাচীনরীতি অনুসারী এবং আঞ্চলিকতামুক্ত তা–ই সাধু ভাষারীতি।
যেমন: 'এক ব্যক্তির দুইটি পুত্র ছিল।'
এই রীতি শুধু লিখিত গদ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

চলিত ভাষারীতি : ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহের মৌখিক ভাষারীতি মানুষের মুখে মুখে রূপান্তর লাভ করে প্রাদেশিক শব্দাবলি গ্রহণ এবং চমৎকার বাক্‌ভঙ্গির সহযোগে গড়ে ওঠে। এই ভাষারীতিকেই চলিত ভাষারীতি বলে। এই রীতি মৌখিক ও লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় ও আদরণীয়।
যেমন: 'একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল।'

সাধু ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

ক. সাধু ভাষার রূপ অপরিবর্তনীয়। অঞ্চলভেদে বা কালক্রমে এর কোনো পরিবর্তন হয় না।
খ. এ ভাষারীতি ব্যাকরণের সুনির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলে। এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
গ. সাধু ভাষারীতিতে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি বলে এ ভাষায় এক প্রকার আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য আছে।
ঘ. সাধু ভাষারীতি শুধু লেখায় ব্যবহার হয়। তাই কথাবার্তা, বক্তৃতা, ভাষণ ইত্যাদির উপযোগী নয়।
ঙ. সাধু ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।

চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য

ক. চলিত ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য মার্জিত ও গতিশীল ভাষা। তাই এটি মানুষের কথাবার্তা ও লেখার ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এটি পরিবর্তনশীল।

খ. এ ভাষারীতি ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়মকানুন দিয়ে সর্বদা ব্যাখ্যা করা যায় না।

গ. চলিত ভাষারীতিতে অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল শব্দের ব্যবহার বেশি বলে এটি বেশ সাবলীল, চটুল ও জীবন্ত।

ঘ. বলার ও লেখার ভাষা বলেই এ ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ, নাটকের সংলাপ ও সামাজিক আলাপ-আলোচনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

ঙ. চলিত ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।

সাধু ও চলিত ভাষারীতির মধ্যে নানাদিক থেকে বেশ কিছু পার্থক্যও রয়েছে। এ দুই ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য থেকেই তার ধারণা পাওয়া যায়। নিচে সাধু ও চলিত ভাষারীতির কয়েকটি পার্থক্য দেখানো হলো :

সাধু ভাষারীতি	চলিত ভাষারীতি
১. সাধু ভাষারীতি সর্বজনগ্রাহ্য লেখার ভাষা।	১. চলিত ভাষারীতি সর্বজনবোধ্য মুখের ও লেখার ভাষা।
২. সাধু ভাষারীতি সব সময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে।	২. চলিত ভাষা সব সময় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না।
৩. সাধু ভাষায় পদবিন্যাস রীতি সুনির্দিষ্ট।	৩. চলিত ভাষায় পদবিন্যাস রীতি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়।
৪. সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি।	৪. চলিত ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম।
৫. সাধু ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী নয়।	৫. চলিত ভাষা বক্তৃতা, ভাষণ ও নাটকের সংলাপের উপযোগী।
৬. সাধু ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।	৬. চলিত ভাষায় সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়পদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।
৭. সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর, দুর্বোধ্য ও মন্থর।	৭. চলিত ভাষা চটুল, সরল ও সাবলীল।
৮. সাধু ভাষারীতি অপরিবর্তনীয়, তাই কৃত্রিম।	৮. চলিত ভাষারীতি পরিবর্তনশীল, তাই জীবন্ত।

নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য দেখা যায়। যথা :

১. বিশেষ্যপদের রূপে

২. সর্বনামপদের রূপে

৩. ক্রিয়াপদের রূপে

৪. অব্যয়পদের রূপে

১. বিশেষ্যপদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
অগ্নি	আগুন
কর্ণ	কান
চন্দ্র	চাঁদ
দন্ত	দাঁত
পক্ষী	পাখি
ব্যাঘ্র	বাঘ
মৎস্য	মাছ
হস্তী	হাতি

২. সর্বনামপদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
এই	এ
ইহা	এ
ইহাকে	একে
ইহাদের	এদের
উহা	ও
উহাদিগের	ওদের
কাহাকে	কাকে
কেহ	কেউ
তাহা	তা
তাহার	তার
যাহা	যা
যাহাদের	যাদের

৩. ক্রিয়াপদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
আসিয়া	এসে
করিয়া	করে
করিয়াছে	করেছে
খাইতেছিল	খাচ্ছিল
গিয়াছিল	গেছিল
ঘুমাইতেছে	ঘুমাচ্ছে
চলিল	চলল
চাহিয়া	চেয়ে
জ্বালাইয়া	জ্বেলে
ডাকিতেছে	ডাকছে
নিদ্রা যাওয়া	ঘুমানো
পড়িব	পড়ব
পার হইয়া	পেরিয়ে
ফুটিয়া উঠিয়াছে	ফুটে উঠেছে
বলিয়াছিলেন	বলেছিলেন
বলিয়া	বলে
বলিতে থাকিবে	বলতে থাকবে
ভাঙিয়া যাইতে লাগিল	ভেঙে যেতে লাগল
লম্ফ প্রদান করিল	লাফ দিল
শুনিল	শুনল
শুনিয়াছিল	শুনেছিল
শয়ন করিলেন	শুলেন
শ্রবণ করিলাম	শুনলাম

৪. অব্যয়পদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত
অদ্য	আজ
অদ্যাপি	আজও
কদাচ	কখনো
তথাপি	তবুও
নচেৎ	নইলে
নতুবা	নইলে
প্রায়শ	প্রায়ই
যদ্যপি	যদিও

সাধু ও চলিত ভাষারীতির উদাহরণ

সাধু ভাষারীতি

"উপন্যাসের অনুরূপ কোনো বস্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর কোনো দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী।"

চলিত ভাষারীতি

"একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিল , আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করল। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস? সে লেজ নেড়ে তার জবাব দিল , –কী জানি মানে তার কী!"

১.৪ কর্ম-অনুশীলন

১. মানুষ ভাষার সাহায্যে মনের কী কী ভাব প্রকাশ করতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি কর।

২. একজন ভাষাবিদের নাম উল্লেখ করে ভাষা সম্পর্কে তিনি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা লেখ।

৩. 'আমার কার্য আমি করিয়াছি। এক্ষণ তাহাদিগের ইচ্ছা হইলে আমাকে পুরস্কার প্রদান করিবে।' – এই রকম করে সাধু ভাষায় দশটি বাক্য তৈরি কর। তারপর সেগুলোকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করে দেখাও।

৪. তোমার পঠিত একটি গল্প থেকে বিভিন্ন পদের একটি তালিকা তৈরি কর। তারপর সেগুলোর সাধুরূপের সাহায্যে দশটি বাক্য রচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধ্বনি ও বর্ণ

২.১ ধ্বনি ও বর্ণ

২.২ ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ

২.৩ কর্ম-অনুশীলন

২.১ ধ্বনি ও বর্ণ

ক. ধ্বনি

কোনো ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে উপাদানসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোকে পৃথকভাবে ধ্বনি বলে। ধ্বনির সঙ্গে অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে না। ধ্বনি তৈরি হয় বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে। ধ্বনি তৈরিতে যেসব বাক্-প্রত্যঙ্গ সহায়তা করে সেগুলো হলো–ফুসফুস, গলনালি, জিহ্বা, তালু, মাড়ি, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। মানুষ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। ফুসফুস থেকে বাতাস বাইরে আসার সময় মুখে নানা ধরনের ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তবে সব ধ্বনিই সব ভাষা গ্রহণ করে না।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও বাধা পায় না এবং যা অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজেই সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা : অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরে কোথাও না কোথাও বাধা পায় এবং যা স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ক্, খ্, গ্, ঘ্, প্, স্ ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলোকে প্রকৃষ্টভাবে শ্রুতিযোগ্য করে উচ্চারণ করতে হলে স্বরধ্বনির আশ্রয় নিতে হয়। যেমন : (ক্+অ=) ক; (গ্+অ=) গ; (প্+অ=) প ইত্যাদি।

খ. বর্ণ

ধ্বনি মানুষের মুখ নিঃসৃত বায়ু থেকে সৃষ্ট, তাই এর কোনো আকার নেই। এগুলো মানুষ মুখে উচ্চারণ করে এবং কানে শোনে। ভাষা লিখে প্রকাশ করার সুবিধার্থে ধ্বনিগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে কিছু চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে। এই চিহ্নের নাম বর্ণ। অর্থাৎ কোনো ভাষা লিখতে যেসব ধ্বনি-দ্যোতক সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে বর্ণ বলে। এই বর্ণসমূহের সমষ্টিই হলো বর্ণমালা।

বাংলা ধ্বনির মতো বর্ণও তাই দুপ্রকার : ১. স্বরবর্ণ ও ২. ব্যঞ্জনবর্ণ।

১. স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। কিন্তু স্বরবর্ণ ১১টি। যথা : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

২. ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। যথা :

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ৎ	
ং	ঃ	ঁ		

বর্ণমালা : কোনো ভাষা লিখতে যে ধ্বনি-দ্যোতক সংকেত বা চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হয় তার সমষ্টিই হলো বর্ণমালা। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহকে একত্রে বাংলা বর্ণমালা বলে।
বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ আছে।

বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের লিখিত রূপ দুটি : ১. পূর্ণরূপ ও ২. সংক্ষিপ্ত রূপ।

১. **স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ** : বাংলা ভাষা লেখার সময় কোনো শব্দে স্বাধীনভাবে স্বরবর্ণ বসলে তার পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

শব্দের প্রথমে : **অ**নেক, **আ**কাশ, **ই**লিশ, **উ**কিল, **ঋ**ণ, **এ**ক ।

শব্দের মধ্যে : বেদু**ই**ন, বা**উ**ল, পাঁ**উ**রুটি, আবহা**ও**য়া।

শব্দের শেষে : ব**ই**, ব**উ**, যা**ও**।

২. **স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ** : অ–ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে পূর্ণরূপের বদলে সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করে। স্বরবর্ণের এ ধরনের সংক্ষিপ্তরূপকে **'কার'** বলে। স্বরবর্ণের 'কার'-চিহ্ন ১০টি। যথা :

আ–কার (া) – মা, বাবা, ঢাকা।

ই–কার (ি) – কিনি, চিনি, মিনি।

ঈ–কার (ী) – শশী, সীমানা, রীতি।

উ–কার (ু) – কুকুর, পুকুর, দুপুর।

ঊ–কার (ূ) – ভূত, মূল্য, সূচি।

ঋ–কার (ৃ) – কৃষক, তৃণ, পৃথিবী।

এ–কার (ে) – চেয়ার, টেবিল, মেয়ে।

ঐ–কার (ৈ) – তৈরি, বৈরী, নৈর্ঋত।

ও–কার (ো) – খোকা, পোকা, বোকা।

ঔ–কার (ৌ) – নৌকা, মৌসুমি, পৌষ।

বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণেরও দুটি লিখিত রূপ রয়েছে : ১. পূর্ণরূপ ও ২. সংক্ষিপ্ত রূপ।

১. **ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ** : ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের প্রথমে, মধ্যে বা শেষে স্বাধীনভাবে বসে।

শব্দের প্রথমে : **ক**বিতা, **প**ড়াশোনা, **ট**গর।

শব্দের মধ্যে : কা**ক**লি, খু**ল**না, ফু**ট**বল।

শব্দের শেষে : আ**ম**, শীত**ল**, সিলে**ট**।

২. **ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ** : অনেক সময় ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের আকার সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে **'ফলা'** বলে। ব্যঞ্জনবর্ণের 'ফলা'–চিহ্ন ৬টি। যথা :

ন / ণ–ফলা (ন / ণ) – চিহ্ন, বিভিন্ন, যত্ন; / পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

ব–ফলা (ব) – পক্ব, বিশ্ব, ধ্বনি।

ম–ফলা (ম) – পদ্মা, মুহম্মদ, তন্ময়।

য–ফলা (্য) – খ্যাতি, ট্যাংরা, ব্যাংক।

র–ফলা (্র) – ক্রয়, গ্রহ। রেফ (র্) – কর্ক, বর্ণ।

ল–ফলা (ল) – ক্লান্ত, গ্লাস, অম্লান।

বাংলা বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণস্থান ও ধ্বনিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত।

বর্ণের উচ্চারণ-স্থান

উচ্চারণস্থান অনুসারে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর নাম নিচের ছকে দেখানো হলো :

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে বর্ণের নাম
অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, য়, শ	তালু	তালব্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ
ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ড়, ঢ়, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ

বর্ণের উচ্চারণ প্রকৃতি

অ : অ-এর উচ্চারণ দু রকম :

স্বাভাবিক (অ-এর মতো) : অজ (অজো), অকাল (অকাল্), কথা (কথা), শপথ (শপথ্), ক্ষণ (খন্), জঞ্জাল (জন্‌জাল্), গয়না (গয়্না), ঘর (ঘর্)।

সংবৃত বা পরিবর্তিত (ও-এর মতো) : অতি (ওতি), নদী (নোদি), অভিধান (ওভিধান্), অতনু (অতোনু), সুমতি (সুমোতি), মৌন (মৌনো), মৃগ (মৃগো)।

আ : আ-এর উচ্চারণও দু রকম :

স্বাভাবিক (আ-এর মতো) : আগামী (আগামি), আমরা (আম্রা), আশা (আশা), আকাশ (আকাশ্), আলো (আলো)।

সংবৃত বা পরিবর্তিত (অ্যা-এর মতো) : জ্ঞান (গ্যাঁন্), বিখ্যাত (বিক্‌খ্যাতো)।

এ : এ–এর দু রকম উচ্চারণ হয় :

স্বাভাবিক (এ–এর মতো) : একটি (এক্‌টি), কেক (কেক্), কেটলি (কেট্‌লি), মেয়ে (মেয়ে), বেগুন (বেগুন্), মেষ (মেশ্)।

সংবৃত বা পরিবর্তিত (অ্যা–এর মতো) : এক (অ্যাক্), খেলা (খ্যালা), বেলা (ব্যালা), কেন (ক্যানো), যেন (য্যানো)।

ঙ : ঙ এবং ং (অনুস্বার)–এর উচ্চারণ অং হয় :

ব্যাঙ (ব্যাং), বাঙালি (বাংআলি), বঙ্কিম (বংকিম্), রঙ (রং)।

ঞ : ঞ–এর উচ্চারণ তিন রকম হয় :

স্বতন্ত্র ঞ : ইঁঅ–এর মতো : মিঞ (মিঁয়ো), মিঞা (মিঁয়া)।

যুক্ত ঞ + চ/ছ/জ/ঝ : ন–এর মতো : অঞ্চল (অন্‌চল্), বাঞ্ছা (বান্‌ছা), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা)।

যুক্ত জ +ঞ : গঁ বা গ্গঁ–এর মতো : জ্ঞান (গ্যাঁন্), যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ)।

শ, ষ, স : এগুলোর কয়েক রকম উচ্চারণ হয় :

স্বতন্ত্র শ–এর মতো : শক্তি (শোক্‌তি), মশা (মশা), শাসন (শাশোন্), সচিব (শোচিব্), সাহিত্য (শাহিত্‌তো), ষাঁড় (শাঁড়্), ষষ্ঠ (শশ্‌ঠো)।

যুক্ত শ + চ/ছ : শ–এর মতো : নিশ্চয় (নিশ্‌চয়্), শিরশ্ছেদ (শিরোশ্‌ছেদ)।

যুক্ত শ + ন/র : ইংরেজি s–এর মতো : প্রশ্ন (প্রোস্‌নো), শ্রম (স্রোম্)।

যুক্ত শ + ঋ/ল : ইংরেজি s–এর মতো : শৃগাল (সৃগাল্), শ্লোক (স্লোক্)।

যুক্ত শ + ব/ম/য : শব্দের প্রথমে শ/শঁ : শ্বাস (শাশ্), শ্বেত (শেত্), শ্মশান (শঁশান্), শ্মশ্রু (শোঁস্রু)।

শব্দের মধ্যে/শেষে শ্‌শ : নিঃশ্বাস (নিশ্‌শাশ্), বিশ্ব (বিশ্‌শো), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ), দৃশ্য (দৃশ্‌শো)।

যুক্ত ষ + ট/ঠ : শ–এর মতো : মিষ্টান্ন (মিশ্‌টান্‌নো), অনুষ্ঠান (ওনুশ্‌ঠান্), ষষ্ঠী (শোশ্‌ঠি)।

যুক্ত স + ত/থ : ইংরেজি s–এর মতো : নিস্তার (নিস্‌তার্), দুস্থ (দুস্‌থো)।

যুক্ত স + ন/র : শব্দের প্রথমে ইংরেজি s : স্নান্ (স্নান), স্নেহ (স্নেহো), স্রষ্টা (স্রোশ্‌টা), স্রোত (স্রোত্)।

শব্দের মধ্যে/শেষে স্‌স : সস্নেহ (শস্‌স্নেহো)।

যুক্ত স + ব/ম : শব্দের প্রথমে শ/শঁ : স্বর্ণ (শর্‌নো), স্মরণ (শঁরোন্‌)।
শব্দের মধ্যে/শেষে শশ্‌/স্‌স : সর্বস্ব (শর্‌বোশ্‌শো), সুস্মিত (শুশ্‌মিতো)।

২.১ ম–ফলা ও ব–ফলার উচ্চারণ

ম–ফলার উচ্চারণ

ক. পদের প্রথমে ম–ফলা থাকলে সে বর্ণের উচ্চারণে কিছুটা ঝোঁক পড়ে এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন : শ্মশান (শঁশান্‌), স্মরণ (শঁরোন্‌)।

কখনো কখনো ‘ম’ অনুচ্চারিত থাকতেও পারে। যেমন : স্মৃতি (সৃতি বা সৃঁতি)।

খ. পদের মধ্যে বা শেষে ম–ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন : আত্মীয় (আত্‌তিঁয়ো), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), বিস্ময় (বিশ্‌শঁয়), ভস্মস্তূপ (ভশ্‌শোঁস্‌তুপ্‌), ভস্ম (ভশ্‌শোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ)।

গ. গ, ঙ, ট, ণ, ন বা ল বর্ণের সঙ্গে ম–ফলা যুক্ত হলে, ম–এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণের স্বর লুপ্ত হয়। যেমন : বাগ্মী (বাগ্‌মি), মৃন্ময় (মৃন্‌ময়), জন্ম (জন্‌মো), গুল্ম (গুল্‌মো)।

ব–ফলার উচ্চারণ

ক. শব্দের প্রথমে ব–ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে শুধু সে বর্ণের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। যেমন : ক্বচিৎ (কোচিৎ), দ্বিত্ব (দিত্‌তো), শ্বাস (শাশ্‌), স্বজন (শজোন), দ্বন্দ্ব (দন্‌দো)।

খ. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে যুক্ত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্‌), পক্ব (পক্‌কো), অশ্ব (অশ্‌শো), বিল্ব (বিল্‌লো)।

গ. সন্ধিজাত শব্দে যুক্ত ব-ফলায় ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন : দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়), দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়)।

ঘ. শব্দের মধ্যে বা শেষে ‘ব’ বা ‘ম’-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন : তিব্বত (তিব্‌বত). লম্ব (লম্‌বো)।

ঙ. উৎ উপসর্গের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বহাল থাকে। যেমন : উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু), উদ্বেল (উদ্‌বেল্‌)।

২.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. তোমার দুই বন্ধুর আলাপ মন দিয়ে শোন। তারপর তাদের যে উচ্চারণগুলো তোমার কাছে অশুদ্ধ মনে হয় তা খাতায় লিখে তোমার শিক্ষককে দেখিয়ে নিজেকে যাচাই করো।

২. ব-ফলাযুক্ত বানানে ব-এর উচ্চারণ কখন বহাল থাকে? সূত্রসহ ১০টি শব্দ লেখ।

৩. "একদিন বিকেলে হন্তদন্ত সাবু বাড়ির উঠান থেকে 'মা মা' বলে চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল। চিৎকার শুনে জৈতুন বিবি হকচকিয়ে ওঠেন। তিনি রান্নাঘরে ছিলেন। দ্রুত পাকশালা থেকে বেরিয়ে এসে সাবুকে জিজ্ঞেস করেন: 'কী রে— ? এত চিক্কর পাড়স্ ক্যান?"

— উদ্ধৃতাংশে যেসব 'কার'-এর ব্যবহার আছে, সেগুলোর ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করো।

—'কার'গুলোর প্রত্যেকটি দিয়ে দুটো নতুন শব্দ তৈরি করো।

৪. "শ্মশানে পৌঁছে শ্বশুরমশাইয়ের শৈশবের স্মৃতি স্মরণ হলো। গিয়েছিলেন বিশ্বনাথবাবুর সৎকার সম্পন্ন করতে পদ্মা নদীর পাড়ে। ফিরে এলেন ভস্মাবৃত হয়ে, শ্মশ্রু মুন্ডন করে।"

—এখানে কোন কোন 'ফলা' ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করো।

— উদ্ধৃতাংশ অবলম্বনে 'শ্মশান', 'শ্বশুর', 'স্মরণ', 'সম্পন্ন', 'শ্মশ্রু' শব্দাবলির উচ্চারণ লেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধি

৩.১ সন্ধি
৩.২ বিসর্গ সন্ধি
৩.৩ কর্ম-অনুশীলন

৩.১ সন্ধি

মানুষ কথা বলার সময় কথার গতি বৃদ্ধি পায়। দ্রুত কথা বলার সময় কখনো কখনো দুটো শব্দের কাছাকাছি থাকা দুটো ধ্বনির উচ্চারণ একত্রিত হয়ে যায়। ব্যাকরণে একে সন্ধি বলা হয়। যেমন: 'আমি বিদ্যা আলয়ে যাব।' বাক্যটি বলার সময় 'আমি বিদ্যালয়ে যাব' হয়ে যায়। এখানে 'বিদ্যা'–এর 'আ'–ধ্বনি এবং 'আলয়'–এর 'আ'–ধ্বনি মিলে গেছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন : দুটি বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্তী হলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য উভয়ের মিলন হয়ে এক বর্ণ বা একের রূপান্তর বা একের লোপ বা উভয়ের রূপান্তর হলে– এরূপ মিলনকে সন্ধি বলে।

এই সংজ্ঞার আলোকে বলা চলে : **পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ধ্বনির মিলনের ফলে যদি এক ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তবে তাকে সন্ধি বলে।**

সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। দুটো ধ্বনির সন্ধিতে প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি এবং পরের শব্দের প্রথম ধ্বনির মিলন ঘটে। সন্ধির ফলে নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। কথা বলার সময় শব্দের উচ্চারণ সহজ হয়। ভাষা সংক্ষিপ্ত হয় এবং শুনতে ভালো লাগে।

সন্ধিতে ধ্বনির চার ধরনের মিলন হয় :

১. উভয় ধ্বনি মিলে একটি ধ্বনি হয়।

২. একটি ধ্বনি বদলে যায়।

৩. একটি ধ্বনি লোপ পায়।

৪. উভয় ধ্বনির বদলে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

সন্ধি প্রধানত দুই ধরনের : ১. স্বরসন্ধি, ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি : সূত্র ও উদাহরণ

১. **স্বরসন্ধি** : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন :

সোনা + আলি = সোনালি	রুপা + আলি = রুপালি
মিথ্যা + উক = মিথ্যুক	কুড়ি + এক = কুড়িক
নদী + এর = নদীর	মা + এর = মায়ের

১. অ, আ ধ্বনির সন্ধি

সূত্র	উদাহরণ	
অ + অ = আ (া)	নব + অন্ন = নবান্ন	পরম + অণু = পরমাণু
অ + আ = আ (া)	জল + আশয় = জলাশয়	পাঠ + আগার = পাঠাগার
আ + অ = আ (া)	কথা + অমৃত = কথামৃত	আশা + অতীত = আশাতীত
আ + আ = আ (া)	বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	মহা + আশয় = মহাশয়

২. ই, ঈ ধ্বনির সন্ধি

ই + ই = ঈ (ী)	অতি + ইত = অতীত	রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র
ই + ঈ = ঈ (ী)	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
ঈ + ই = ঈ (ী)	শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র	মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ (ী)	শ্রী + ঈশ = শ্রীশ	পৃথিবী + ঈশ্বর = পৃথিবীশ্বর

৩. উ, ঊ ধ্বনির সন্ধি

উ + উ = ঊ (ূ)	কটু + উক্তি = কটূক্তি	মরু + উদ্যান = মরূদ্যান
উ + ঊ = ঊ (ূ)	লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি	বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব
ঊ + উ = ঊ (ূ)	বধূ + উৎসব = বধূৎসব	বধূ + উক্তি = বধূক্তি
ঊ + ঊ = ঊ (ূ)	ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব	

২. অ/আ, ই/ঈ ধ্বনির সন্ধি

অ/আ + ই/ঈ = এ (ে)	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা	যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট
	অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা	মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর

৩. অ/আ, উ/ঊ ধ্বনির সন্ধি		
অ/আ + উ/ঊ = ও (ো)	সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়	কথা + উপকথন = কথোপকথন
	চল + ঊর্মি = চলোর্মি	মহা + ঊর্মি = মহোর্মি
৪. অ/আ, ঋ ধ্বনির সন্ধি		
অ/আ + ঋ = অর (র্)	দেব + ঋষি = দেবর্ষি	রাজা + ঋষি = রাজর্ষি
অ/আ + ঋত = আর	শীত + ঋত = শীতার্ত	ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত
৫. অ/আ, এ/ঐ ধ্বনির সন্ধি		
অ/আ + এ/ঐ = ঐ (ৈ)	জন + এক = জনৈক	তথা + এব = তথৈব
	মত + ঐক্য = মতৈক্য	মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য
৬. অ/আ, ও/ঔ ধ্বনির সন্ধি		
অ/আ + ও/ ঔ = ঔ (ৌ)	জল + ওকা = জলৌকা	মহা + ওষধি = মহৌষধি
	চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য	মহা + ঔষধ = মহৌষধ
৭. ই/ঈ–এর পর ভিন্ন ধ্বনির সন্ধি		
ই/ঈ + অ/আ = য (্য/্যা)	অতি + অন্ত = অত্যন্ত	নদী + অম্বু = নদ্যম্বু
	ইতি + আদি = ইত্যাদি	মসী + আধার = মস্যাধার
ই/ঈ + উ/ঊ = য (্যু/্যূ)	অতি + উক্তি = অত্যুক্তি	প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ
ই/ঈ + এ = য (্যে)	প্রতি + এক = প্রত্যেক	
৮. উ/ঊ–এর পর ভিন্ন ধ্বনির সন্ধি		
উ/ঊ + অ/আ = ব/বা	সু + অল্প = স্বল্প	সু + আগত = স্বাগত
উ/ঊ + ই/ঈ = বি/বী	অনু + ইত = অন্বিত	তনু + ঈ = তন্বী
উ/ঊ + এ = বে	অনু + এষণ =অন্বেষণ	
৯. এ/ঐ-এর পর ভিন্ন ধ্বনির সন্ধি		
এ/ঐ + অ/আ = অয়/আয়	নে + অন = নয়ন	নৈ + অক = নায়ক
১০.ও/ঔ–এর পর ভিন্ন ধ্বনির সন্ধি		
ও/ঔ + অ/আ = অব/আব	পো + অন = পবন	গো + আদি = গবাদি
	লো + অন = লবণ	পৌ + অক = পাবক
ও/ঔ + ই = অবি/আবি	পো + ইত্র = পবিত্র	নৌ + ইক = নাবিক
ও/ঔ + উ = আবু	ভৌ + উক = ভাবুক	
ও/ঔ + এ = অবে	গো + এষণা = গবেষণা	

ব্যঞ্জনসন্ধি : সূত্র ও উদাহরণ

২. ব্যঞ্জনসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন :

কাঁচা + কলা = কাঁচকলা　　নাতি + বৌ = নাতবৌ

ছোট + দা = ছোড়দা　　উৎ + চারণ = উচ্চারণ

আব + না – আনা　　চাব + টি – চাট্টি

১. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি

অ + ছ = চ্ছ　　প্র + ছদ = প্রচ্ছদ

আ + ছ =চ্ছ　　কথা + ছলে = কথাচ্ছলে

ই + ছ = চ্ছ　　পরি + ছদ = পরিচ্ছদ

উ + ছ = চ্ছ　　তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া

২. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনির সন্ধি

ক + অ = গ　　দিক্ + অন্ত = দিগন্ত

ট + আ = ড> ড়　　ষট্ + আনন = ষড়ানন

ত + অ = দ　　তৎ + অন্ত = তদন্ত

প + অ = ব　　সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি

ত + চ/ছ = চ্চ/চ্ছ　　উৎ + চারণ = উচ্চারণ　　উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

দ + চ/ছ = চ্চ/চ্ছ　　বিপদ্ + চয় = বিপচ্চয়　　বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া

ত + জ/ঝ = জ্জ/জ্ঝ　　যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন　　কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা

দ + জ = জ্জ　　বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক

ত + ড = ড্ড　　উৎ + ডীন = উড্ডীন

ত + ল = ল্ল　　উৎ + লিখিত = উল্লিখিত

ত + শ = চ্ছ　　চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি

ত + হ = দ্ধ　　তৎ + হিত = তদ্ধিত

দ + হ = দ্ধ　　পদ্ + হতি = পদ্ধতি

ক্ + দ = গ্ + দ	বাক্ + দান = বাগ্‌দান	
ক্ + ব = গ্ + ব	দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়	
ট্ + য = ড্ >ড় + য	ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র	
ত্ + গ = দ্ + গ	উৎ + গিরণ = উদ্‌গিরণ	
ত্ + ঘ = দ্ + ঘ	উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন	
ত্ + ব = দ্ +ব	উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন	
ত্ + ভ = দ্ + ভ	উৎ + ভব = উদ্ভব	
ত্ + র = দ্ + র	তৎ + রূপ = তদ্রূপ	
ক্ + ন = ঙ + ন	দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয়	
ত্ + ম = ন + ম	তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে	
ত্ + ন = ন্ন	উৎ + নতি = উন্নতি	জগৎ + নাথ = জগন্নাথ
ত্ + ম = ন্ম	তৎ + ময় = তন্ময়	মৃৎ + ময় = মৃন্ময়
ম্ + ক = ঙ/ং + ক	শম্ + কা = শঙ্কা	সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ
ম্ + খ = ং + খ	সম্ + খ্যা = সংখ্যা	
ম্ + গ = ং + গ	সম্ + গীত = সংগীত	
ম্ + ঘ = ং + ঘ	সম্ + ঘাত = সংঘাত	
ম্ + চ = ঞ্চ	সম্ + চয় = সঞ্চয়	
ম্ + ত = ন্ত	সম্ + তাপ = সন্তাপ	
ম্ + দ = ন্দ	সম্ + দর্শন = সন্দর্শন	
ম্ + ধ = ন্ধ	সম্ + ধান = সন্ধান	
ম্ + ন = ন্ন	কিম্ + নর = কিন্নর	
ম্ + য = ং + য	সম্ + যম = সংযম	
ম্ + র = ং + র	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ	
ম্ + শ = ং + শ	সম্ + শয় = সংশয়	
ম্ + হ = ং + হ	সম্ + হার = সংহার	

১০১৬

বিসর্গসন্ধি

বিসর্গ (ঃ)–এর সঙ্গে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। বিসর্গসন্ধিও এক ধরনের ব্যঞ্জনসন্ধি। উচ্চারণের দিক থেকে বিসর্গ দু রকম:

১. র্–জাত বিসর্গ : শব্দের শেষে র্ থাকলে উচ্চারণের সময় র্ লোপ পায় এবং র্–এর জায়গায় বিসর্গ (ঃ) হয়। উচ্চারণে র্ বজায় থাকে। যেমন : অন্তর > অন্তঃ + গত = অন্তর্গত (অন্তোর্গতো)।

৬. স্–জাত বিসর্গ : শব্দের শেষে স্ থাকলে সন্ধির সময় স্ লোপ পায় এবং স্–এর জায়গায় বিসর্গ (ঃ) হয়। উচ্চারণে স্ বজায় থাকে। যেমন : নমস্ > নমঃ + কার = নমস্কার (নমোশ্কার্)।

বিসর্গসন্ধি দু-ভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ (ঃ) ও স্বরধ্বনি মিলে
২. বিসর্গ (ঃ) ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে।

১. বিসর্গ ও স্বরধ্বনির সন্ধি

ক. অ–ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অ–ধ্বনি থাকলে বিসর্গ ও অ–ধ্বনি স্থলে ও–কার হয়। যেমন :

ততঃ + অধিক = ততোধিক
যশঃ + অভিলাষ = যশোভিলাষ
বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক

খ. অ–ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অ, আ, উ–ধ্বনি থাকলে বিসর্গ ও অ–ধ্বনি মিলে র হয়। যেমন :

পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ
পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি
পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি

ক. অ–ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে বর্গের ৩য়/ ৪র্থ/ ৫ম ধ্বনি অথবা য, র, ল, হ থাকলে বিসর্গ ও অ–ধ্বনি স্থলে র–জাত বিসর্গে র/ রেফ (´) এবং স–জাত বিসর্গে ও–কার হয়। যেমন :

র–জাত বিসর্গ : র

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত
পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান
পুনঃ + বার = পুনর্বার
অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত
পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন

স–জাত বিসর্গ : ও

ক. মনঃ + গত = মনোগত — সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত

তিরঃ + ধান = তিরোধান — তপঃ + বন = তপোবন

অধঃ + মুখ = অধোমুখ — মনঃ + যোগ = মনোযোগ

মনঃ + রম = মনোরম — মনঃ + লোভা = মনোলোভা

মনঃ + হর = মনোহর

খ. বিসর্গের পরে চ/ছ থাকলে বিসর্গের স্থলে শ; ট/ঠ থাকলে ষ এবং ত/থ থাকলে স হয়। যেমন :

নিঃ + চয় = নিশ্চয় — শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র — নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার — নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়

দুঃ + তর = দুস্তর — নিঃ + তেজ = নিস্তেজ

ইতঃ + তত = ইতস্তত — দুঃ + থ = দুস্থ

গ. অ/আ ভিন্ন অন্য স্বরের সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে স্বরধ্বনি, বর্গের ৩য় / ৪র্থ / ৫ম ধ্বনি অথবা য, র, ল, হ থাকলে বিসর্গ স্থলে র হয়। যেমন :

নিঃ + অবধি = নিরবধি — নিঃ + আপদ = নিরাপদ

নিঃ + গত = নির্গত — নিঃ + ঘণ্ট = নির্ঘণ্ট

নিঃ + বাক্ = নির্বাক — নিঃ + ভয় = নির্ভয়

আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব — আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা — দুঃ + আচার = দুরাচার

দুঃ + গতি = দুর্গতি — দুঃ + বোধ = দুর্বোধ

প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব — দুঃ + মর = দুর্মর

দুঃ + যোগ = দুর্যোগ — দুঃ + লভ = দুর্লভ ১০১৬

ঘ. র–জাত বিসর্গের পরে র থাকলে বিসর্গ লোপ পায় এবং প্রথম স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন :

নিঃ + রব = নীরব
নিঃ + রস = নীরস
নিঃ + রোগ = নীরোগ

ঙ. অ/আ ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থলে স হয়। যেমন :

নমঃ + কার = নমস্কার
তিরঃ + কার = তিরস্কার
পুরঃ + কার = পুরস্কার
ভাঃ + কর = ভাস্কর

চ. ই/উ ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থলে ষ হয়। যেমন :

নিঃ + কাম = নিষ্কাম
নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ
নিঃ + ফল = নিষ্ফল
বহিঃ + কার = বহিষ্কার
চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ
চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ
আবিঃ + কার = আবিষ্কার
দুঃ + পাচ্য = দুষ্পাচ্য

ছ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ পায় না। যেমন :

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল
মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট
শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া
অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ

জ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিসর্গ লোপ পেলেও সন্ধি হয় না। যেমন :

অতঃ + এব = অতএব

বিসর্গ সন্ধির কিছু ব্যতিক্রম :

অহঃ + অহ = অহরহ
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ

৩.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. **সতী ঈশ** বাবু মাধ্যমিক **বিদ্যা আলয়ের** শিক্ষক। তার **অহম্ কার** নেই, তিনি **সম্ গীত** ভালোবাসেন। – উদ্ধৃতাংশে মোটা দাগ দেয়া শব্দগুলোর সন্ধি কর। তোমার পছন্দমতো এ রকম আরও কয়েকটি শব্দের বাক্য লেখ।

২. তুমি আজ সারা দিন যাদের কথাবার্তা শুনেছ, সেসব কথার মধ্যে থেকে মনে করে ১০টি সন্ধিবদ্ধ শব্দ বের কর। তারপর সেগুলোকে আলাদা করে কোন প্রকার সন্ধি তা লেখ। যেমনঃ তোমার বাবা বললেন, "দোকান থেকে পাঁশসের আলু, গোটা পাঁচেক কাঁচকলা আর এক কৌটা গব্য–ঘৃত নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। দেখ, যেন বেশকম না হয়।" – এখানে সন্ধিবদ্ধ শব্দগুলো হচ্ছে–

পাঁশসের, পাঁচেক, কাঁচকলা, গব্য, বেশকম।

পাঁশসের = পাঁচ + সের = ব্যঞ্জনসন্ধি

পাঁচেক = পাঁচ + এক = ব্যঞ্জনসন্ধি

কাঁচকলা = কাঁচা + কলা = ব্যঞ্জনসন্ধি

গব্য = গো + য = ব্যঞ্জনসন্ধি

বেশকম = বেশি + কম = ব্যঞ্জনসন্ধি

৩. বহিষ্কার, আবিষ্কার, নমস্কার, পুরস্কার শব্দগুলো সন্ধির কোন নিয়ম মেনে গঠিত হয়েছে? নিয়মগুলো লেখ এবং সে নিয়ম অনুযায়ী তোমার পাঠ্য বই থেকে আরও কয়েকটি শব্দ খুঁজে নিয়ে একটি তালিকা তৈরি কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শব্দ ও পদ

৪. শব্দ ও পদ
৪.১ লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ
৪.২ বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ
৪.৩ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ : সংজ্ঞাবাচক, শ্রেণিবাচক, সমষ্টিবাচক, ভাববাচক ও ক্রিয়াবাচক
৪.৪ নির্দেশক সর্বনামের রূপ (চলিত রীতি) : 'এ', 'ও'
৪.৫ ধাতু ও ক্রিয়াপদ
৪.৬ সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া
৪.৭ মৌলিক ও সাধিত ধাতু
৪.৮ ক্রিয়ার কাল : বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা
৪.৯ কর্ম-অনুশীলন

৪. শব্দ ও পদ

অর্থ হলো শব্দের প্রাণ। এক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলনে যদি কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায় তবে তাকে **শব্দ** বলে। যেমন : ক, ল, ম – এই তিনটি ধ্বনি একসাথে জুড়ে দিলে হয় : কলম (ক+ল+ম)। 'কলম' লেখার একটি উপকরণকে বোঝায়। সুতরাং এটি একটি শব্দ। এ রকম : আমি, বাজার, যাই ইত্যাদিও শব্দ। এগুলোর আলাদা আলাদা অর্থ আছে। কিন্তু এ রকম আলাদা আলাদা শব্দ মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। তাই অর্থপূর্ণ শব্দ জুড়ে জুড়ে মানুষ তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে থাকে। যেমন : 'আমি বাজারে যাই।'– এটি একটি বাক্য। এখানে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। কতগুলো অর্থপূর্ণ শব্দ যখন একত্রিত হয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করে, তখন তাকে **বাক্য** বলে।

এবার লক্ষ করি : আমি, বাজার , যাই – তিনটি অর্থপূর্ণ শব্দ।
আমি বাজারে যাই – একটি মনের ভাব প্রকাশক বাক্য।

এখানে 'বাজার' শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময় কিছুটা (বাজার+এ) বদলে গেছে। বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার সময় শব্দের শেষে এই ধরনের কিছু বর্ণ যোগ হয়। এগুলোকে বলে **বিভক্তি**। শব্দে বিভক্তি যুক্ত হলেই তাকে

পদ বলা হয়। তাহলে বলা যায় বিভক্তি যুক্ত শব্দকে অথবা বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে **পদ** বলে। পদ পাঁচ প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. অব্যয় ও ৫. ক্রিয়া।

৪.১ লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ

লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো কোনোটি পুরুষ জাতীয়, কোনোটি স্ত্রী জাতীয়, কোনোটি আবার স্ত্রী–পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। তাই যেসব চিহ্ন বা লক্ষণ দ্বারা শব্দকে পুরুষ, স্ত্রী বা অন্য জাতীয় হিসেবে আলাদা করা যায়, তাকে **লিঙ্গ** বলে।

লিঙ্গ চার প্রকার। যথা :

১. পুংলিঙ্গ বা পুরুষবাচক শব্দ। যেমন : বাবা, ছেলে, বিদ্বান, সুন্দর।

২. স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীবাচক শব্দ। যেমন : মা, মেয়ে, বিদুষী, সুন্দরী।

৩. উভয়লিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন : মানুষ, শিশু, সন্তান, বাঙালি।

৪. ক্লীবলিঙ্গ বা অলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন : বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল।

পুংলিঙ্গ বা পুরুষবাচক শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বা স্ত্রীবাচক শব্দে রূপান্তর করাকে **লিঙ্গান্তর** বা **লিঙ্গ পরিবর্তন** বলে। লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন :

১. পুরুষবাচক শব্দের শেষে –আ (া), –ঈ (ী), –নী, –আনি, –ইনি ইত্যাদি স্ত্রীপ্রত্যয় জুড়ে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করা যায়। যেমন : প্রথম > প্রথমা, চাকর > চাকরানি, ছাত্র > ছাত্রী, জেলে > জেলেনি।

২. কখনো কখনো ভিন্ন শব্দযোগেও পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে পরিবর্তন হয়। যেমন : বাবা > মা, ছেলে > মেয়ে, পুরুষ> নারী, সাহেব > বিবি, স্বামী > স্ত্রী, কর্তা > গিন্নি, ভাই > বোন, পুত্র > কন্যা, বর > কনে।

৩. শব্দের আগে পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ জুড়ে দিয়েও শব্দের লিঙ্গান্তর হয়ে থাকে। যেমন : পুরুষ-মানুষ > মেয়ে-মানুষ, হুলো বিড়াল > মেনি বিড়াল, মদ্দা ঘোড়া > মাদি ঘোড়া, ব্যাটাছেলে > মেয়েছেলে, এঁড়ে বাছুর > বকনা বাছুর, বলদ গরু > গাই গরু।

৪. কতকগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে মহিলা, নারী ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে শব্দের লিঙ্গান্তর হয়। যেমন : কবি > মহিলা কবি, ডাক্তার > মহিলা ডাক্তার, সভ্য > নারী সভ্য, সৈন্য > নারী সৈন্য।

৫. কোনো কোনো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে পরিবর্তন হয়। যেমন : গয়লা > গয়লা বউ, বোন পো > বোন ঝি, ঠাকুর পো > ঠাকুর ঝি।

৬. কতকগুলো শব্দে কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন : কবিরাজ, কৃতদার, অকৃতদার, বিপত্নীক, স্ত্রৈণ।

৭. কতকগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন : সতীন, সৎমা, সধবা, এয়ো, দাই।

নিচে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তনের কিছু নিয়ম ও উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. শব্দের শেষে '–আ' প্রত্যয় যোগ করে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অজ	অজা	প্রিয়	প্রিয়া
আধুনিক	আধুনিকা	প্রবীণ	প্রবীণা
কোকিল	কোকিলা	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা
চতুর	চতুরা	মাননীয়	মাননীয়া
চঞ্চল	চঞ্চলা	শিষ্য	শিষ্যা
নবীন	নবীনা	সরল	সরলা

২. শব্দের শেষে 'আ'–এর জায়গায় '–ই' প্রত্যয় বসিয়ে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাকা	কাকি	বুড়া	বুড়ি
চাচা	চাচি	নানা	নানি
দাদা	দাদি	মামা	মামি

৩. শব্দের শেষে '–ঈ' প্রত্যয় যোগ করে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কিশোর	কিশোরী	মানব	মানবী
ছাত্র	ছাত্রী	ময়ূর	ময়ূরী
তরুণ	তরুণী	রাক্ষস	রাক্ষসী
দাস	দাসী	সিংহ	সিংহী
নর	নারী	সুন্দর	সুন্দরী
পাত্র	পাত্রী	হরিণ	হরিণী

২০২৫

৪. শব্দের শেষে '–নি / –নী' প্রত্যয় যোগ করে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কামার	কামারনী	জেলে	জেলেনি
কুমার	কুমারনী	ধোপা	ধোপানি

৫. শব্দের শেষে '–আনি' / 'আনী' প্রত্যয় যোগ করে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চাকর	চাকরানি	মেথর	মেথরানি
ঠাকুর	ঠাকুরানি	নাপিত	নাপিতানি
অরণ্য	অরণ্যানী	হিম	হিমানী
ইন্দ্র	ইন্দ্রানী	শূদ্র	শূদ্রানী

৬. শব্দের শেষে 'ইনী' প্রত্যয় যোগ করে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাঙাল	কাঙালিনী	গোয়ালা	গোয়ালিনী
অনাথ	অনাথিনী	বাঘ	বাঘিনী
নাগ	নাগিনী	বিদেশি	বিদেশিনী
মানী	মানিনী	গুণী	গুণিনী
তপস্বী	তপস্বিনী	ধনী	ধনিনী
শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী	সুকেশ	সুকেশিনী

৭. শব্দের শেষে '–ইকা' প্রত্যয় যোগ করে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বালক	বালিকা	পাঠক	পাঠিকা
লেখক	লেখিকা	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা
গায়ক	গায়িকা	নায়ক	নায়িকা
সেবক	সেবিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা

৮. পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' থাকলে 'ত্রী' হয় :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নেতা	নেত্রী	কর্তা	কর্ত্রী
শ্রোতা	শ্রোত্রী	ধাতা	ধাত্রী

২০২৫

৯. পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'অত', 'বান', 'মান', 'ঈয়ান' থাকলে 'অতী', 'বতী', 'মতী', 'ঈয়সী' হয় :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সৎ	সতী	মহৎ	মহতী
গুণবান	গুণবতী	রূপবান	রূপবতী
শ্রীমান	শ্রীমতী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
গরীয়ান	গরীয়সী	মহীয়ান	মহীয়সী

৪.২ বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ

ব্যাকরণে বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা। তাই, যে শব্দ দিয়ে ব্যাকরণে কোনো কিছুর সংখ্যার ধারণা প্রকাশ করা হয়, তাকে **বচন** বলে।

বাংলা ভাষায় বচন দু প্রকার । যথা : ১. একবচন ও ২. বহুবচন।

১. একবচন : যে শব্দ দিয়ে কোনো বস্তু, প্রাণী বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে **একবচন** বলে। যেমন :

পাখাটি খুঁজে পাচ্ছি না।
গামছাখানা কোথায় রাখলে?
কাজল কি বাড়ি ফিরেছে?
শিক্ষক বললেন, "দুই আর দুই চার হয়।"

একবচন প্রকাশের উপায়

বাংলা ভাষায় একবচন প্রকাশের কিছু উপায় আছে। যেমন :

ক. শব্দের মূল রূপের সাথে কিছু যোগ না করে :

'আমার **বাড়ি** যাইও ভ্রমর, বসতে দেব পিঁড়ে।'
আজ **স্কুল** ছুটি।
রীতা গান শিখতে গেছে।
বাস ঢাকা ছেড়েছে।

খ. শব্দের শেষে টি, টা, খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক যোগ করে :

মেয়েটি খুব চালাক।
তোমার **কলমটা** দাও তো।

নৌকাখানি বেশ সুন্দর হয়েছে।
বইখানা আমি পড়েছি।
দড়িগাছা দিয়ে যা তো মা।
দাদুর হাতে **লাঠিগাছা** বেশ মানিয়েছে।

গ. শব্দের আগে এক, একটা, একটি, একখানা, একজন ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে :

এক দেশে ছিল **এক** রাজা।
তোমার সাথে **একটা** কথা ছিল।
একটি কলম নিয়ে দুভাইয়ের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়েছে।
একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ এনো তো।
একজন ছাত্র এসেছিল তোমার কাছে।

২. বহুবচন : যে শব্দ দিয়ে একের অধিক সংখ্যক বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণীর ধারণা পাওয়া যায়, তাকে **বহুবচন** বলে। যেমন :

আমরা সেখানে গিয়েছিলাম।
ছেলেরা মাঠে খেলছে।
'**শিশুগণ** দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।'
'রাখাল **গরুর পাল** লয়ে যায় মাঠে।'

বহুবচন গঠনের নিয়ম ও উদাহরণ

বাংলা ভাষায় বহুবচন গঠনের নানা উপায় আছে। প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং উন্নত প্রাণিবাচক ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহুবচনবোধক বিভক্তি, প্রত্যয় ও সমষ্টিবাচক শব্দযোগে বহুবচন গঠন করা হয়ে থাকে। যেমন :

১. শব্দের শেষে রা, এরা, গুলো, গুলি, দের বিভক্তি যোগ করে :

রা – **ছেলেরা** বল খেলছে।
তারা আজ আর আসবে না।
এরা – "**ভাইয়েরা** আমার, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব'।"
শ্রমিকেরা ধর্মঘট ডেকেছে।
গুলো – **আমগুলো** রাজশাহী থেকে এসেছে।
ছেলেগুলো খুব হৈচৈ করছে।

গুলি – **বইগুলি** জায়গা মতো তুলে রাখ।
দের – **মুক্তিযোদ্ধাদের** আমরা শ্রদ্ধা করি।

২. শব্দের শেষে গণ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, মণ্ডলী, মালা, গুচ্ছ, পাল, দল, দাম, ঝাঁক, আবলি, সব, সমূহ, রাজি, রাশি, পুঞ্জ, শ্রেণি ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করে :

গণ – '**শিশুগণ** দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।'
বৃন্দ – **ভক্তবৃন্দ** কবিকে শুভেচ্ছা জানালেন ।
কুল – সন্ধ্যায় **পক্ষিকুল** নীড়ে ফিরে এসেছে।
মণ্ডলী – **শিক্ষকমণ্ডলী** নবীন ছাত্রদের বরণ করে নিলেন।
মালা – 'দেখিতে গিয়াছি **পর্বতমালা**, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।'
গুচ্ছ – আমি রবীন্দ্রনাথের '**গল্পগুচ্ছ**' পড়েছি।
পাল – 'রাখাল **গরুর পাল** লয়ে যায় মাঠে।'
দল – জাতীয় **ক্রিকেটদলে** তার জায়গা হয়েছে।
দাম – **শৈবালদামে** পুকুর ভরেছে ।
ঝাঁক – **পায়রার ঝাঁক** বাকুম বাকুম করছে।
আবলি – আজ রাতে **পদাবলি** কীর্তন শুনতে যাব।
সব – '**পাখিসব** করে রব রাতি পোহাইল।'
সমূহ – অতিরিক্ত বৃক্ষনিধনের ফলে **বনসমূহ** উজাড় হয়ে যাচ্ছে।
রাজি – লাইব্রেরির **গ্রন্থরাজির** মধ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার।
রাশি – বাজারে নিয়ে যাবার জন্য **পুষ্পরাশি** চয়ন করা হয়েছে।
পুঞ্জ – **মেঘপুঞ্জের** অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।
শ্রেণি – **ধনিকশ্রেণি** সব সময় **নিম্নশ্রেণির** উপর খবরদারি করে থাকে।

৩. শব্দের আগে অনেক, অজস্র, অসংখ্য, প্রচুর, বহু, বিস্তর, নানা, ঢের, সব, সকল, সমস্ত, হরেক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে :

অনেক – এবার পরীক্ষায় **অনেক ছাত্র** ফেল করেছে।
অজস্র – তার **অজস্র টাকা**–পয়সা হয়েছে।
অসংখ্য – বাংলাদেশের **অসংখ্য মানুষ** এখনো অশিক্ষিত।
প্রচুর – বাজারে **প্রচুর আম** উঠেছে।
বহু – তিনি **বহু সম্পত্তির** মালিক।
বিস্তর – 'সে কহে **বিস্তর মিছা**, যে কহে বিস্তর।'
নানা – '**নানা মুনির** নানা মত।'

২০২৫

ঢের – বৃষ্টি আসতে এখনো **ঢের** বাকি।
সব – বাজারে গিয়ে **সব টাকা** খরচ হয়ে গেল।
সকল – পৃথিবীর **সকল মানুষ** আমার ভাই।
সমস্ত – তার বলা **সমস্ত কাহিনিই** ছিল বানোয়াট।
হরেক – মেলায় **হরেক রকম** জিনিস পাওয়া যায়।

৪. একই শব্দ পর পর দুবার বসিয়ে :

ফুলে – বাগানটা **ফুলে ফুলে** ভরে গেছে।
হাঁড়ি – বরযাত্রীরা **হাঁড়ি হাঁড়ি** সন্দেশ নিয়ে এসেছে।
কাঁড়ি – মেয়ের বিয়েতে **কাঁড়ি কাঁড়ি** টাকা খরচা হয়ে গেল।
বলে – তোমাকে **বলে বলে** আর পারলাম না।
খেটে – আমি **খেটে খেটে** সারা হলাম।
দ্বারে – **দ্বারে দ্বারে** ঘুরেও আজ ভিক্ষা জুটল না।
ছোট – 'আমাদের ছোট গাঁয়ে **ছোট ছোট** ঘর।'
বড় – বাবা **বড় বড়** আম কিনে এনেছেন।
ঘরে – আজ **ঘরে ঘরে** বিজয়ের আনন্দ।
বিন্দু – **বিন্দু বিন্দু** জল দিয়ে তৈরি হয় বিশাল সাগর ।
ভালো – ক্লাসের **ভালো ভালো** ছেলেকে পুরস্কার দেওয়া হবে।
যে– **যে যে** যাবে, তারা লঞ্চে ওঠো।

৫. আগে সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে :
কাঞ্চনের বিয়েতে **শ পাঁচেক** অতিথি খাবে।
সপ্তাহ দুই পরে মাছের দাম কমে যাবে।
শিয়াল তার **সাত** ছেলেকে কুমিরের কাছে পড়তে দিল।
দশ কেজি রসগোল্লা দিন তো।

৬. কখনো কখনো একবচনের রূপ দিয়ে :

মানুষ মরণশীল।

বাঙালি সব পারে।

বাগানে **ফুল** ফুটেছে।

বাজারে **লোক** জমেছে।

পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়।

বনে **বাঘ** থাকে।

গরু আমাদের দুধ দেয়।

* বিশেষ দ্রষ্টব্য

বচন মূলত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের এক বা একাধিক সংখ্যার ধারণা নির্দেশ করে। সে-কারণে শুধু বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়।

উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে গণ, বৃন্দ, মণ্ডলী, বর্গ এবং অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি ব্যবহৃত হয়।

রা, এরা, গণ, গুলো, কুল, সকল, সব, সমূহ প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলা বাক্যে একই সঙ্গে একাধিক বহুবচনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন :

সকল ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। (ভুল)
সকল ছাত্রকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। (শুদ্ধ)
ছাত্রদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। (শুদ্ধ)

৪.৩ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

আগেই বলা হয়েছে : পদ পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

বিশেষ্যপদ

বাক্যে ব্যবহৃত যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কাজ বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্যপদ বলে। এক কথায়, কোনো কিছুর নামকে **বিশেষ্যপদ** বলে। যেমন : নজরুল, মানুষ, বই, খাতা, লেখাপড়া, পশু, সভা, সমিতি, ঢাকা, খুলনা, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি।

বিশেষ্যপদের নানা শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। যেমন :

১. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী, স্থান, নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রন্থ ইত্যাদির নির্দিষ্ট নাম বোঝায়, তাকে **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** বলে। একে নামবাচক বিশেষ্যও বলা হয়। যেমন :

ব্যক্তির নাম : আলাওল, বঙ্কিম, নজরুল, সুকান্ত, রোকেয়া, সমীরণ বড়ুয়া, রবার্ট, মিল্টন, হ্যারি।

প্রাণীর নাম : গরু, ছাগল, ভেড়া, সিংহ, বাঘ, হাঁস, মুরগি, ময়না, টিয়া, শালিক, হিপপোটেমাস।

স্থানের নাম : খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, দিল্লি, মস্কো, লন্ডন, প্যারিস।

নদ-নদীর নাম : ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, নীলনদ, আমাজান, হোয়াংহো।

সমুদ্রের নাম : বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, আরব সাগর।

পাহাড়–পর্বতের নাম : গারো পাহাড়, হিমালয়, লালমাই, কেওক্রাডাং, হিন্দুকুশ, ককেশাস, আন্দিজ।

গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, হিমু অমনিবাস, বেড়াল মানবী, বাঁধ ভেঙে দাও।

বাক্যে প্রয়োগ

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি।

সুন্দরবন খুলনা বিভাগে অবস্থিত।

আমাদের বাড়ি **ধলেশ্বরী** নদীর পাড়ে।

আমি **'অগ্নিবীণা'** পড়েছি।

গরু গৃহপালিত পশু।

আমি **হিমালয়** দেখি নি।

লন্ডনে নজিবের মামা থাকেন।

দুবলারচর বঙ্গোপসাগরের একটি চর।

২. শ্রেণিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা ব্যক্তি, প্রাণী, স্থান, নদী, পর্বত ইত্যাদির সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে **শ্রেণিবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন : মানুষ, পাখি, পর্বত, কবি, শহর, বই, গাছ, বাঙালি, মাছ, সাগর ইত্যাদি।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের সাথে শ্রেণিবাচক বিশেষ্যের আপাত মিল লক্ষ করা গেলেও বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী বা স্থানের নাম বোঝায়।

২০২৫

কিন্তু শ্রেণিবাচক বিশেষ্যপদ এসবের সাধারণ বা অনির্দিষ্ট নাম প্রকাশ করে। যেমন :

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (নির্দিষ্ট)	শ্রেণিবাচক বিশেষ্য (অনির্দিষ্ট)
১. **রবীন্দ্রনাথ** বিশ্বকবি।	১. **কবি** চিরকাল বরণীয়।
২. **মানুষটি** ক্ষুধায় কাতর।	২. **মানুষ** মরণশীল।
৩. পোড়াবাড়ির **চমচম** খুব ভালো মিষ্টি।	৩. **মিষ্টি** সবাই পছন্দ করে না।
৪. আমি **ইলিশ** মাছ খেতে ভালোবাসি।	৪. সবাই **মাছ** খেতে ভালোবাসে।
৫. আমরা **ঢাকা** শহরে থাকি।	৫. আমরা **শহরে** থাকি।
৬. আমি **'অগ্নিবীণা'** পড়ছি।	৬. আমি **বই** পড়ছি।
৭. **হিমালয়** বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত।	৭. **পর্বতে** ওঠা খুব বিপজ্জনক।
৮. **ময়না** পাখি কথা বলে।	৮. **পাখি** আকাশে ওড়ে।
৯. **পদ্মা** বাংলাদেশের বড় নদী।	৯. **নদী** সাগরে গিয়ে মেশে।
১০. **সুন্দরীগাছ** সুন্দরবনে পওয়া যায়।	১০. **গাছ** আমাদের প্রাণ বাঁচায়।

৩. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা একজাতীয় ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাকে **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন : জনতা, সভা, সমিতি, শ্রেণি, দল, সংঘ, পাল, ঝাঁক, গুচ্ছ, মালা, সারি ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ

জনতাই পারে দেশকে এগিয়ে নিতে।

সভা নয়টায় শুরু হয়েছে।

এখানে একটা **বহুমুখী সমবায় সমিতি** গড়ে উঠেছে।

বিশেষ্যপদের নানা **শ্রেণিবিভাগ** রয়েছে।

দল বদল করে আর কতদিন চলবে?

একপাল হরিণ আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল।

ইংরেজদের **নৌবহর** বিশ্বখ্যাত।

আমি **সেনাবাহিনীর** কুচকাওয়াজ দেখেছি।

৪. ভাববাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্যপদ দ্বারা ক্রিয়ার ভাব বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে **ভাববাচক** বা **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন : ভোজন, শয়ন, দর্শন, গমন, শ্রবণ, করা, দেখা, শোনা ইত্যাদি।

২০২৫

ভাববাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ এক নয়। যেমন :

ভাববাচক বিশেষ্য	ক্রিয়াপদ
১. কোটবাড়ি **দর্শন** করে এলাম।	১. আমি কোটবাড়ি দেখেছি।
২. মহারাজের **ভোজন**-পর্ব শেষ হয়েছে।	২. আমরা **খেয়েছি**।
৩. বাবার **শয়ন** এখনো সম্পন্ন হয় নি।	৩. বাবা **শুয়েছেন**।
৪. খুকুর **নাচন** দেখে যা।	৪. খুকু **নাচছে**।
৫. তার বোধহয় **ফেরা** হবে না।	৫. সে **ফিরেছে**।

৪.৪ নির্দেশক সর্বনামের রূপ (চলিত রীতি) : 'এ', 'ও'

বাক্যে বিশেষ্যপদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে **সর্বনাম পদ** বলে। যেমন :

বিশেষ্য : **বকুল** ভালো ছেলে।

সর্বনাম : **সে** প্রতিদিন স্কুলে যায়।

তার স্বাস্থ্য ভালো।

তাকে সবাই ভালোবাসে।

এখানে বিশেষ্য 'বকুল'–এর পরিবর্তে 'সে', 'তার', 'তাকে' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করায় বাক্যগুলো শ্রুতিমধুর হয়েছে।

বাংলা ভাষায় সর্বনাম পদ নানারকম হয়। যেমন :

১.ব্যক্তিবাচক সর্বনাম : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তিনি, এরা, ওরা ইত্যাদি।

২. নির্দেশক সর্বনাম : এ, এটি, সেটি, সেগুলো ইত্যাদি।

৩. সাকল্যবাচক সর্বনাম : সকল, সব, সমুদয় ইত্যাদি।

৪. সাপেক্ষ সর্বনাম : যে-সে, যা-তা, যিনি-তিনি ইত্যাদি।

৫. প্রশ্নসূচক সর্বনাম : কী, কার, কাদের, কিসে ইত্যাদি।

৬. অনির্দেশক সর্বনাম : কেউ, কোন, কেহ, কিছু ইত্যাদি।

৭. আত্মবাচক সর্বনাম : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি ইত্যাদি।

৮. অন্যাদিবাচক সর্বনাম : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

নির্দেশক সর্বনামের রূপ : 'এ', 'ও'

যে সর্বনাম পদ সাধারণত বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে দেয়, তাকে **নির্দেশক সর্বনাম পদ** বলে। যেমন :

এ, এই, এরা, ইহারা, ইহা, এঁরা, ইহাদের, এঁদের, ও, ওরা, ওদের,
ওঁদের, ঐ, উনি, উহা, উহাদের ইত্যাদি।

বিশেষ্যপদের সাথে যেমন বিভক্তি যোগ হয়ে শব্দ গঠন করে, তেমনি বিভক্তি, প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত হয়ে সর্বনামের রূপ হয়।

নিচে নির্দেশক সর্বনাম 'এ' এবং 'ও'–এর চলিত রূপ দেখানো হলো।

এ–এর রূপ

১. প্রাণিবাচক রূপ :

	একবচন	বহুবচন
	এ, এর, ইনি, এঁর	এরা, এদের, এঁরা, এঁদের

বাক্যে প্রয়োগ : এ আমার ভাই; এর নাম উজ্জ্বল।
ইনি আমার চাচা; এঁরা করাচি থাকেন। এঁদের লোহালক্কড়ের বড় ব্যবসা আছে।

২. অপ্রাণিবাচক রূপ :

	একবচন	বহুবচন
	এটা, এটি, এখানা	এসব, এগুলো, এসমস্ত

বাক্যে প্রয়োগ : এটা এখান থেকে সরাও।
এটি আপনার বই।
এগুলো টেবিলে রাখ।
এসবের জন্য তুমি দায়ী।
এসমস্ত কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছেন?

ও–এর রূপ

১. প্রাণিবাচক রূপ :

	একবচন	বহুবচন
	ও, ওর, ওঁ, উনি, ওদের, ওকে	ওরা, ওদের, ওঁরা, ওঁদের, ওদেরকে

বাক্যে প্রয়োগ : ও যেন ফিরে আসে।
উনি সম্পর্কে আমার মামা হন। ওঁদের বাড়ি ময়মনসিংহ।
ওকে এখন ডাকার দরকার নেই।
ওদের যেতে বল।

২. অপ্রাণিবাচক রূপ :

	একবচন	**বহুবচন**
	ওই, ওটি, ওখানা	ওসব, ওগুলো, ওসমস্ত

বাক্যে প্রয়োগ : তবে **ওই** কথাই রইল।
ওটি কিসের বই?
ওখানা আবার কবে কিনলে?
ওসব কথা ছাড়ো তো।
তোমার **ওগুলো** কাল দেখে দেব।
ওসমস্ত গুলবাজি এবার বন্ধ কর।

৪.৫ ধাতু ও ক্রিয়াপদ

ক্রিয়াপদ

যে পদ দ্বারা কোনো কিছু করা বা কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। যেমন :
বাবা এসেছেন।
ঘড়িতে দশটা বাজে।
আমি অঙ্ক করছি।

ক্রিয়াপদ নানা রকম হয় :

১. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন :
সেতু স্কুলে যায়।
বিথু গান গায়।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন :
আমি বাড়ি **গিয়ে** ....
সে বই **নিয়ে** ....

এখানে **'গিয়ে'**, **'নিয়ে'** ক্রিয়ার দ্বারা কথা শেষ হয় নি। বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ রয়েছে। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য আরও ক্রিয়া চাই। যেমন :
আমি বাড়ি গিয়ে **খাব**।
সে বই নিয়ে পড়তে **বসেছে**।

সুতরাং, **'গিয়ে'**, **'নিয়ে'** হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া। আর **'খাব'**, **'বসেছে'** এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া।

২০২৫

৩. সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে, তাকে **সকর্মক** ক্রিয়া বলে। যেমন :

স্বপন চিঠি লিখছে।
কাঞ্চন বই পড়ছে।

৪. অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না, তাকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে। যেমন :

স্বপন লিখছে।
কাঞ্চন পড়ছে।

৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে **দ্বিকর্মক** ক্রিয়া বলে। যেমন :

শিক্ষক ছাত্রদের বাংলা পড়াচ্ছেন।
মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

৬. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হয়, তাকে **প্রযোজক** ক্রিয়া বলে। যেমন :

মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
সাপুড়ে সাপ খেলায়।

৭. যৌগিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে **যৌগিক** ক্রিয়া বলে। যেমন :

সে পাস করে গেল।
সাইরেন বেজে উঠল।

৪.৬ সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

সকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া পদের কর্ম থাকে তাকে **সকর্মক ক্রিয়া** বলে।
বাক্যের ক্রিয়াকে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্মপদ। কর্মযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন :

মা ভাত রান্না করছেন।

এ বাক্যে ক্রিয়াপদ হচ্ছে 'রান্না করছেন'।

প্রশ্ন : কী রান্না করছেন?
উত্তর : ভাত।

অতএব 'রান্না করছেন' ক্রিয়া পদটির কর্ম হচ্ছে 'ভাত'। 'রান্না করছেন' সকর্মক ক্রিয়া।

অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তাকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে। যেমন :

সৌরভ পড়ে।

সৌরভ কী পড়ে? – এ প্রশ্নের উত্তর নেই। অর্থাৎ এ বাক্যে 'পড়ে' ক্রিয়াপদের কোনো কর্ম নেই। তাই 'পড়ে' অকর্মক ক্রিয়া।

প্রয়োগ–বৈশিষ্ট্যে সকর্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়া হতে পারে। যেমন :

সকর্মক ক্রিয়া	অকর্মক ক্রিয়া
১. আমি টিফিন খেয়েছি।	১. আমি টিফিনে খেয়েছি।
২. মাখন রায় গান গাচ্ছে।	২. মাখন রায় গানে মজেছে।

ধাতু

ক্রিয়ার মূল অংশকে ধাতু বলে।
ক্রিয়া পদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় :

১. ধাতু বা ক্রিয়ামূল : কর্, যা, খা, পা, বল্, দেখ্, খেল্, দে ইত্যাদি।
২. ক্রিয়াবিভক্তি : আ, ই, ছি, ছে, বে, তে, লে, লাম ইত্যাদি।

ধাতু তিন প্রকার। যথা : ১. মৌলিক ধাতু ২. সাধিত ধাতু ও ৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. মৌলিক ধাতু : যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে **মৌলিক ধাতু** বলে। যেমন : কর্, চল্, পড়্, বড়্, পা, যা, দে, খা, হ্ ইত্যাদি।

২. সাধিত ধাতু : মৌলিক ধাতু বা নাম-শব্দের পরে আ-প্রত্যয়যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে **সাধিত ধাতু** বলে। যেমন :

কর্ + আ = করা
দেখ্ + আ = দেখা
বল্ + আ = বলা

৩. **যৌগিক ধাতু** : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে কর্, দে, হ্, পা, খা ইত্যাদি মৌলিক ধাতু মিলিত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকে **যৌগিক** বা **সংযোগমূলক ধাতু** বলে। যেমন : ভয় কর্, ভালো হ্, উত্তর দে, মার খা, দুঃখ পা ইত্যাদি।

৪.৭ মৌলিক ও সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু : মৌলিক ধাতুকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়ে থাকে। যেমন :

অঙ্ক্ + অন = অঙ্কন : ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিধু প্রথম হয়েছে।

দৃশ্ + য = দৃশ্য : দুর্ঘটনার মর্মান্তিক দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না।

কৃ + তব্য = কর্তব্য : ছাত্রদের কর্তব্য লেখাপড়া করা।

হস্ + য = হাস্য : অকারণ হাস্য-পরিহাস ত্যাগ কর।

আঁক্ + আ = আঁকা : কী সব আঁকাআঁকি করছ?

দেখ্ + আ = দেখা : জাদুঘর আমার কয়েকবার দেখা।

কর্ + অ = কর : তুমি কী কর?

হাস্ + ই = হাসি : তোমার হাসিটি খুব সুন্দর।

খাট্ + বে = খাটবে : যত বেশি খাটবে ততই সুফল পাবে।

বিগড়্ + আনো : তোমার বিগড়ানো ছেলেকে ভালো করার সাধ্য আমার নেই।

টান্ + আ : আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না, আমি যাব না।

জম্ + আট = জমাট : অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধেছে।

সাধিত ধাতু : মৌলিক ধাতু বা নাম শব্দের পরে আ–প্রত্যয়যোগে সাধিত ধাতু গঠিত হয়ে থাকে।

সাধিত ধাতু তিন প্রকার। যথা :

১. প্রযোজক ধাতু

২. নাম ধাতু

৩. কর্মবাচ্যের ধাতু

১. **প্রযোজক ধাতু** : মৌলিক ধাতুর পরে (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) আ–প্রত্যয়যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে **প্রযোজক ধাতু** বা **ণিজন্ত ধাতু** বলে। যেমন :

পড়্ + আ = পড়া : শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

কর্ + আ = করা : সে নিজে করে না, অন্যকে দিয়ে করায়।

খেল্ + আ = খেলা : 'হা - ডু - ডু' আমাদের জাতীয় খেলা।

২. **নাম ধাতু** : বিশেষ্য, বিশেষণ ও অনুকার অব্যয়ের পরে আ–প্রত্যয়যোগে গঠিত ধাতুকে **নাম ধাতু** বলে। যেমন :

ঘুম্ + আ = ঘুমা : বাবা ঘুমাচ্ছেন।

ধমক্ + আ = ধমকা : আমাকে যতই ধমকাও, আমি এ কাজ করব না।

হাত্ + আ = হাতা : অন্যের পকেট হাতানো আমার স্বভাব নয়।

৩. **কর্মবাচ্যের ধাতু** : বাক্যে কর্তার চেয়ে কর্মের সাথে যখন ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রধান হয়ে ওঠে, তখন সে ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বলে। কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার মূলকে **কর্মবাচ্যের ধাতু** বলে।

মৌলিক ধাতুর সাথে আ–প্রত্যয়যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু গঠিত হয়। যেমন :

কর্ + আ = করা : আমি তোমাকে অঙ্কটি করতে বলেছি।

হার্ + আ = হারা : বইটি হারিয়ে ফেলেছি।

খা + ওয়া = খাওয়া : তোমার খাওয়া হলে আমাকে বলো।

৪.৮ ক্রিয়ার কাল : বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা

লক্ষ কর :

১. আজ স্কুল খোলা।
২. গতকাল স্কুল বন্ধ ছিল।
৩. আগামীকাল থেকে পরীক্ষা শুরু।

ওপরের বাক্য তিনটিতে ক্রিয়াপদগুলো নিষ্পন্ন হবার বিভিন্ন সময় বোঝানো হয়েছে। প্রথম বাক্যে **'খোলা'** ক্রিয়াটি বর্তমান সময়ে নিষ্পন্ন হয়। দ্বিতীয় বাক্যে **'ছিল'** ক্রিয়াটি পূর্বে বা অতীতে সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয়

বাক্যে **'হবে'** ক্রিয়াটি দ্বারা কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে এমন ভাব প্রকাশ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যের ক্রিয়াপদ বিভিন্ন সময় বা কালে সম্পন্ন হওয়া নির্দেশ করে থাকে। ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার এই সময় বা কালকে **ক্রিয়ার কাল** বলে।

ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা :

১. বর্তমান কাল

২. অতীত কাল

৩. ভবিষ্যৎ কাল

১. বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া এখন সম্পন্ন হয় বা হচ্ছে বোঝায়, তাকে **বর্তমান কাল** বলে। যেমন :

আমি পড়ি।

সে যায়।

কাকলি দৌড়ায়।

আইয়ুব গান গায়।

২. অতীত কাল : যে ক্রিয়া আগেই সম্পন্ন হয়েছে, তার কালকে **অতীত কাল** বলে। যেমন :

আমি তাকে দেখেছিলাম।

গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।

মা রান্না করছিলেন।

৩. ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া আগামীতে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে এমন বোঝায়, তার কালকে **ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন :

বৃষ্টি আসবে।

সীমা কাল গান গাইবে।

পার্থ নাচবে।

প্রত্যেকটি কাল আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা :

১. বর্তমান কাল : ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. পুরাঘটিত বর্তমান

২. অতীত কাল : ক. সাধারণ অতীত খ. ঘটমান অতীত গ. পুরাঘটিত অতীত ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত

৩. ভবিষ্যৎ কাল : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

১. বর্তমান কাল

ক. সাধারণ বর্তমান : যে ক্রিয়ার কাজটি বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে বা হয়, তাকে **সাধারণ বর্তমান** বা **নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল** বলে। যেমন :

সকালে সূর্য ওঠে।

দুই আর দুইয়ে চার হয়।

আমি রোজ বিদ্যালয়ে পড়তে যাই।

খ. ঘটমান বর্তমান : যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে ঘটছে বা চলছে, এখনো শেষ হয়ে যায় নি, তাকে **ঘটমান বর্তমান কাল** বলে। যেমন :

আমার ছোট ভাই লিখছে।

ছেলেরা এখনো ফুটবল খেলছে।

টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক দেখাচ্ছে।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান : যে ক্রিয়া কিছু আগে শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো রয়েছে, তাকে **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** বলে। যেমন :

এখন বাবা অফিস থেকে ফিরেছেন।

এবার মা খেতে ডেকেছেন।

অবশেষে আমি ইংরেজি পড়া শেষ করেছি।

২. অতীত কাল

ক. সাধারণ অতীত : যে ক্রিয়া অতীত কালে সাধারণভাবে সংঘটিত হয়েছে, তাকে **সাধারণ অতীত কাল** বলে। যেমন :

তিনি খুলনা থেকে এলেন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক খুব ভালো ব্যাট করলেন।

আমি খেলা দেখে এলাম।

খ. ঘটমান অতীত: যে ক্রিয়া অতীত কালে চলেছিল, তখনো শেষ হয় নি বোঝায়, তাকে **ঘটমান** অতীতকাল বলে। যেমন :

রিতা ঘুমাচ্ছিল।

সুমন বই পড়ছিল।

আমি ছেলেবেলার কথা ভাবছিলাম।

গ. পুরাঘটিত অতীত : যে ক্রিয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল** বলে। যেমন :

আমরা রাজশাহী গিয়েছিলাম।

তুমি কি তার পরীক্ষা নিয়েছিলে?

আমি তাকে ভাত খেতে দেখেছিলাম।

ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত : যে ক্রিয়া অতীতে প্রায়ই ঘটত এমন বোঝায়, তাকে **নিত্যবৃত্ত অতীত কাল** বলে। যেমন :

বাবা প্রতিদিন বাজার করতেন।

স্কুল ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে রোজ পড়া নিয়ে আলাপ করতাম।

ছুটিতে প্রতি বছর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম।

৩. ভবিষ্যৎ কাল

ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়া পরে বা আগামীতে সাধারণভাবে সংঘটিত হবে, তার কালকে **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন :

বাবা আজ আসবেন।

'আমি হব সকালবেলার পাখি।'

তুমি হয়তো সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' পড়ে থাকবে।

খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে শুরু হয়ে চলতে থাকবে, তার কালকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন :

সুমন হয়তো তখন দেখতে থাকবে।

মনীষা দৌড়াতে থাকবে।

আমিনা কথা বলতে থাকবে।

গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে এবং সেটি বোঝাতে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়, এমন হলে তার কালকে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যেমন :

তুমি হয়তো আমাকে এ কথা বলে থাকবে।

সম্ভবত আগামীকাল পরীক্ষার ফল বের হয়ে থাকবে।

কাঞ্চন বোধহয় কঠিন অঙ্কটা বুঝে থাকবে।

৪. অনুজ্ঞা

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয়, তাকে **অনুজ্ঞা** বলে। যেমন :

১. বর্তমান কালের অনুজ্ঞা : তোমরা কাজ করো।
রোহান লিখুক।
মিথ্যা কথা বলো না।
অঙ্কটা বুঝিয়ে দেবেন?
আমাকে তুমি রক্ষা করো, প্রভু।
আদেশ করুন জাহাঁপনা।

বর্তমান কালের অনুজ্ঞার মধ্যম ও নাম পুরুষের রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	ক্রিয়াপদ
তুচ্ছার্থক	তুই, তোরা	–০ শূন্য	কর্, যা, পা, খা, দে
সাধারণ	তুমি, তোমরা, সে, তারা	–অ, –ও, –উক	করো, যাও, খাও, দেও
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তাঁরা, তিনি	–উন, –ন, –এন	যাউন, যান, করুন, করেন

২. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা : সব সময় সত্যি বলবে।
বড় হও, বুঝতে পারবে।
অসুস্থ হলে ওষুধ খাবে।

ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার মধ্যম ও নাম পুরুষের রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	ক্রিয়াপদ
তুচ্ছার্থক	তুই, তোরা	–স	করিস, যাস, খাস
সাধারণ	তুমি, তোমরা, সে, তারা	–ও, –বে	করো, করবে, খেও, যাবে
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তাঁরা, তিনি	–বেন	করবেন, দেখবেন, যাবেন, দেবেন

৪.৯ কর্ম-অনুশীলন

১. **বাবুদের** বাড়ির ছেলে**গুলো** খুব ভালো। তারা **বিস্তর** লেখাপড়া করে। **সকল** লোক **তাদের** ভালোবাসে। স্কুলে ওরা শিক্ষক**মণ্ডলীর** নয়নমণি। তারা বন্ধু**মহলেও অনেক** জনপ্রিয়। গুরুজনেরা ওদের রবীন্দ্রনাথের ‘গল্প**গুচ্ছ**’ পড়িয়েছেন।

—উপরের অনুচ্ছেদটিতে মোটা দাগের শব্দগুলো বহুবচন প্রকাশক প্রত্যয় ও শব্দ। এগুলো তোমার খাতায় লেখ। তারপর এগুলোর কোনটি প্রাণিবাচক কোনটি অপ্রাণিবাচক বা কোনটি উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

২. আমার বাবা একজন শিক্ষক। চাচা সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। আমার মামা একজন পুলিশ অফিসার। আমার দাদি ও নানি আমাকে খুব ভালোবাসেন। আমাদের একজন গৃহকর্মী আছে, তাকে সবাই বলে আয়া। আমি ওস্তাদের কাছে গান শিখি। আমার ওস্তাদ একজন বড় গায়ক। আমাদের মালী আমাকে ফুল গাছের যত্ন করতে শেখায়। রাজা-বাদশাহ, রাক্ষস-দানব-ভূত-পিশাচের গল্প শোনায়। আমার বন্ধু মালাও এসব গল্প শোনে। তার একটি মেনি বিড়াল আছে, সেটিও শোনে।

—উপরের অনুচ্ছেদ থেকে বিভিন্ন লিঙ্গবাচক শব্দগুলো খুঁজে বের কর এবং সেগুলোর কোনটি কোন শ্রেণির লিঙ্গের অন্তর্গত তালিকাকারে লেখ।

৩. নদী পার হয়ে, ওপাড়ে কুমোরদের একটা গ্রামের ভেতরে সারাদিন দেখছি ওদের মাটির কাজ। হাঁড়ি পাতিল সরা সানকি তৈরি করছে ওরা। বেশি কৌতূহল নিয়ে দেখেছি ফলকের কাজ। মাটির ফলকে ফুলের নকশা, রবীন্দ্রনাথ, বেণীবন্ধনরত যুবতীর চিত্র, জয়নুলের আঁকা গরুর চাকা ঠেলে তোলার প্রতিলিপি, উড়ন্ত পরী, ময়ূরপঙ্খি নৌকোর চিত্র, চোখ বুজে নজরুল যে বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই ফটোগ্রাফের নকল। বাঁশবনে আচ্ছন্ন শীতল একটি গ্রামে, অবিশ্বাস্য ঝিম ধরা নীরবতার ভেতরে, সবুজ শ্যাওলা ধরা কুমোরদের প্রাঙ্গণে সার দিয়ে সাজানো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জয়নুল।

—উপরের অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষ্য (সংজ্ঞাবাচক, শ্রেণিবাচক, সমষ্টিবাচক), ক্রিয়া (সমাপিকা, অসমাপিকা) পদগুলো খুঁজে বের করে একটি ছক তৈরি কর।

৪. সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে কয়েকটি বাক্য বানাও। যেমন :

ক. চণ্ডীদাস **বলেন**, ‘সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’
[অতীত কালের অর্থে, প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে]

খ. এখন **তবে** আসি।
[ভবিষ্যৎ কালের অর্থে, অনুমতি প্রার্থনায়]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শব্দগঠন

৫.১ ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈত
৫.২ শব্দগঠন : প্রাথমিক ধারণা
৫.৩ কর্ম-অনুশীলন

৫.১ ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈত

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে **ধ্বন্যাত্মক শব্দ** বলে। যেমন :

ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ডাক বা ধ্বনি)

মড় মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ)

ঠা ঠা (রোদের তীব্রতার অনুভব)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ কতগুলো ধ্বনির মিলিত রূপ। এই সম্মিলিত ধ্বনি একদিকে কানে শোনা ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট, অন্যদিকে মানুষের নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রতীক।

বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত হলে এগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন :

১. মানুষের ধ্বনির অনুকৃতি :

ভেউ ভেউ : লোকটি **ভেউ ভেউ** করে কান্না শুরু করল।

হি হি : এত হি হি করে হাসার কারণ কী?

ট্যা ট্যা : কানের কাছে এত ট্যা ট্যা করো না তো, মাথা ধরে গেল।

গুনগুন : মেয়েটি **গুনগুন** করে গান গাইছে।

খক খক : বুড়ো লোকটি **খকখক** করে কাশছে।

২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকৃতি :

ঘেউ ঘেউ : কুকুরটি **ঘেউ ঘেউ** করে চিৎকার করছে।

মিউ মিউ : বিড়ালটি **মিউ মিউ** করে ডেকে কোলে এসে বসল।

কুহু কুহু : বসন্তে কোকিল ডেকে ওঠে **কুহু কুহু** রবে।

কা কা : কাকগুলো একসাথে **কা কা** করে ডেকে উঠল।

গর গর : তখন বাঘটি রাগে **গর গর** করতে লাগল।

৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকৃতি :

ঘচঘচ : কৃষকেরা **ঘচঘচ** করে ধান কেটে চলেছে।

মড়মড় : গাছটা **মড়মড়** করে ভেঙে পড়ল।

গুড়গুড় : **গুড়গুড়** করে মেঘ ডাকছে।

কলকল : **কলকল** করে নদী বয়ে চলেছে।

ঝমঝম : **ঝমঝম** করে বৃষ্টি নামল।

৪. অনুভূতির কাল্পনিক অনুকৃতি :

ঝিকিমিকি : 'চাঁদের কিরণ লেগে করে **ঝিকিমিকি**।'

ঠা ঠা : **ঠা ঠা** রোদে ঘুরে বেড়িও না।

কুট কুট : মশা **কুট কুট** করে কামড়াচ্ছে।

ছম ছম : ভয়ে গা **ছম ছম** করছে।

চোঁ চোঁ : ক্ষিধেয় পেট **চোঁ চোঁ** করছে।

অনুকার শব্দ

শব্দের অনুকরণে বা বিকারে যেসব শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে **অনুকার শব্দ** বলে। অনুকার শব্দ ধ্বন্যাত্মক শব্দেরই রকমফের মাত্র। যেমন :

আবোলতাবোল : নোমান সকাল থেকে **আবোলতাবোল** বকে চলেছে।

কাপড়চোপড় : মা বাইরে যাবার জন্য **কাপড়চোপড়** পরে তৈরি হয়ে বসে আছেন।

খাবারদাবার : এইমাত্র **খাবারদাবার** শেষ হয়েছে।

গোছগাছ : জিনিসপত্র **গোছগাছ** করে নাও, এক্ষুনি বেরুব।

চোটপাট : আমাকে **চোটপাট** করে কোনো লাভ হবে না।

জড়সড় : ভয়ে ছেলেটা **জড়সড়** হয়ে আছে।

টেনেটুনে : মেয়েটি **টেনেটুনে** পাস করেছে।

ফিটফাট : হীরা সব সময় **ফিটফাট** থাকে।

বকেঝকে : শুধু **বকেঝকে** কি ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায়?

মিটমাট : সমস্যাটা **মিটমাট** হয়ে গেছে।

রান্নাবান্না : **রান্নাবান্না** শেষ, এবার খাবার পালা।

শেষমেশ : ঘটনাটি **শেষমেশ** বড় কর্তার কানে গিয়ে উঠল।

হাবাগোবা : হাবলু এখনো **হাবাগোবাই** থেকে গেল।

দ্বিরুক্ত শব্দ

বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুবার ব্যবহার করলে তার অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে বা বিশেষভাবে জোরালো অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। এগুলোকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন :

জ্বর (রোগ বিশেষ) : আমার **জ্বর** হয়েছে।
জ্বর জ্বর (জ্বরের ভাব, জ্বর নয়) : আমার **জ্বর জ্বর** বোধ হচ্ছে।

মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় এ রকম প্রচুর দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের দ্বিরুক্ত শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. শব্দের দ্বিরুক্তি বা শব্দদ্বৈত
২. পদের দ্বিরুক্তি বা পদদ্বৈত
৩. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

শব্দদ্বৈত : একই শব্দ পর পর দুবার ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বা **শব্দদ্বৈত** বলে।

শব্দদ্বৈত নানাভাবে গঠিত হতে পারে। যেমন:

১. একই শব্দ দুবার ব্যবহার করে :

বছর বছর : **বছর বছর** পরীক্ষায় ভালো ফল করছ, এতে আমরা সবাই খুশি।

বস্তা বস্তা : **বস্তা বস্তা** ধান ভরে নিয়ে ট্রাকটি চলে গেল।

ফোঁটা ফোঁটা : বারান্দার ছাদ থেকে **ফোঁটা ফোঁটা** পানি পড়ছে।

আস্তে আস্তে : একটু **আস্তে আস্তে** চল, আমার পায়ে ব্যথা।

চলতে চলতে : **চলতে চলতে** কথা বলো।

২০২৩

মনে মনে : **মনে মনে** পড়ার চেয়ে আওয়াজ করে পড়া ভালো।

জনে জনে : সকালে সূর্য ওঠে একথা **জনে জনে** জিজ্ঞেস করে জানার প্রয়োজন হয় না।

কথায় কথায় : **কথায় কথায়** তোমার কথা এসে গেল।

খেয়ে খেয়ে : এ সমাজে অনেকেই **খেয়ে খেয়ে** দেহটা আলুর বস্তার মতো করে ফেলেছে।

বলে বলে : 'তোকে দিয়ে কিছুই হবে না'– একথা **বলে বলে** সবুজকে মনোবলহীন করা হয়েছে।

২. একই শব্দের সমার্থক (প্রায়) আর-একটি শব্দ ব্যবহার করে :

আশা-ভরসা : একমাত্র ছেলেটি বাবা-মায়ের **আশা-ভরসার** স্থল।

আত্মীয়-স্বজন : বাড়িতে অনেক **আত্মীয়-স্বজন** এসেছে।

কথা-বার্তা : তার সাথে আমার **কথা-বার্তা** হয়েছে।

চাল-চলন : লোকটির **চাল-চলন** রহস্যজনক।

ঢাক-ঢোল : ব্যাপারটা **ঢাক-ঢোল** পিটিয়ে না জানালে কি চলত না?

ধন-দৌলত : কুতুবুদ্দিন সাহেব অনেক **ধন-দৌলতের** মালিক।

ভয়-ডর : ছেলেটির **ভয়-ডর** বলে কিছু নেই।

মাথা-মুণ্ডু : তোমার কথার **মাথা-মুণ্ডু** কিছুই বুঝলাম না।

সুখ-শান্তি : নেশাগ্রস্ত ছেলেমেয়ের কারণে সংসারে **সুখ-শান্তি** নষ্ট হয়।

৩. জোড় শব্দের পর–অংশ আংশিক পরিবর্তন করে :

কাছাকাছি : কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের বাড়ির **কাছাকাছি** আমরা থাকি।

চেয়েচিন্তে : অনেক **চেয়েচিন্তে** তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে এনেছি।

ডাকাডাকি : আমাকে **ডাকাডাকি** করার দরকার হবে না, সময়মতো চলে যাব।

মারধর : এত **মারধর** খেয়েও চোরটি চুরি করা মালামাল ফেরত দিল না।

রাগারাগি : এসো **রাগারাগি** না করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি।

৪. বিপরীত শব্দযোগে :

আসল–নকল : এখন **আসল–নকল** চেনা বড় দায়।

আসা–যাওয়া : আমাদের বাড়িতে তার **আসা–যাওয়া** আছে।

ইচ্ছা–অনিচ্ছা : তোমার **ইচ্ছা–অনিচ্ছায়** কিছু যায়–আসে না।

বেচা–কেনা : উৎসবের বাজারে **বেচা–কেনা** বেশ জমে উঠেছে।

জন্ম–মৃত্যু : **জন্ম–মৃত্যু** সৃষ্টিকর্তার হাতে।

দেনা–পাওনা : **দেনা–পাওনা** মিটিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ভালো–মন্দ : মানুষের চরিত্রে **ভালো–মন্দ** দুদিকই থাকে।
হার–জিত : খেলায় **হার–জিত** থাকবেই।

৫. অনুকার ধ্বনিযোগে :

টুপটাপ : **টুপটাপ** করে বৃষ্টি পড়ছে।
টুংটাং : চুড়ি বাজে **টুংটাং**।
চিকচিক : '**চিকচিক** করে বালি কোথা নাই কাদা।'
শনশন : **শনশন** করে বায়ু বয়।
ছলছল : তার চোখ **ছলছল** করছে।
টনটন : হাতটা ব্যথায় **টনটন** করছে।

৫.২ শব্দগঠন : প্রাথমিক ধারণা

এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টিকে শব্দ বলে। অর্থই শব্দের প্রাণ।

শব্দই বাক্যে ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এজন্য নতুন নতুন শব্দগঠন করতে হয়। নানা উপায়ে শব্দগঠন হতে পারে। যেমন :

১. ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে 'কার' যোগ করে :

ব্ + া + ড়্ + ি = বাড়ি
ত্ + ৃ + ণ = তৃণ

এ রকম : গাড়ি, বাবা, বিষ, নৌকা, কাকলি, রাজশাহী ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে 'ফলা' যোগ করে :

ক্ + র = ক্র : বক্র
ক্ + ল = ক্ল : ক্লান্ত

এ রকম : চক্র, বাক্য, পদ্ম, রান্না ইত্যাদি।

এগুলো হচ্ছে শব্দগঠনের প্রাথমিক উপায়।

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন : হাত, পা, মুখ, ফুল, পাখি, গাছ ইত্যাদি।

আবার কিছু শব্দ আছে যা বিভিন্ন উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। সেগুলোকে বলা হয় সাধিত শব্দ। যেমন :

ডুব্ + উরি = ডুবুরি
ঘর + আমি = ঘরামি
মেঘ + এ = মেঘে ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ নানা উপায়ে গঠিত হতে পারে :

১. মৌলিক শব্দযোগে : পাগল + আমি = পাগলামি
বই + পত্র = বইপত্র

২. শব্দের শেষে বিভক্তি যোগ করে : আমা + কে = আমাকে
বাড়ি + র = বাড়ির
চট্টগ্রাম + এ = চট্টগ্রামে

৩. শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করে :

অ – অকাজ, অভাব, অনীল, অচেনা, অথৈ।
আ – আধোয়া, আলুনি, আগাছা, আগমন, আকণ্ঠ, আসমুদ্র।
নি – নিখুঁত, নিলাজ, নিরেট, নির্ণয়, নিবারণ, নিষ্কলুষ।
বি – বিভুঁই, বিফল, বিপথ, বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল।
সু – সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকণ্ঠ, সুনীল, সুচতুর।

৪. শব্দের পরে প্রত্যয় যোগ করে :

আই : ঢাকাই, নিমাই, জগাই, মিঠাই।
উক : ভাবুক, মিশুক, মিথ্যুক, লাজুক।
ইক : সাহিত্যিক, বৈদিক, দৈনিক, মাসিক।
অন : কাঁদন, বাঁধন, ভাঙন, জ্বলন।
খানা : চিড়িয়াখানা, বৈঠকখানা, ছাপাখানা।
অনীয় : করণীয়, বরণীয়, স্মরণীয়।

৫. সন্ধির সাহায্যে :

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়
শীত + ঋত = শীতার্ত
সম্ + তাপ = সন্তাপ
দিক্ + অন্ত = দিগন্ত
শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
পদ্ + হতি = পদ্ধতি
সম্ + বাদ = সংবাদ
পরি + ছদ = পরিচ্ছদ

৬. সমাসের সাহায্যে :

বসতের জন্য বাড়ি = বসতবাড়ি
মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
নদী মাতা যার = নদীমাতৃক

২০১৫

দুই দিকে অপ (জল) যার = দ্বীপ
রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি

৭. শব্দদ্বৈতের মাধ্যমে :

বাড়ি > বাড়ি বাড়ি
ঘরে > ঘরে ঘরে
ঢং > ঢং ঢং
লাল > লাল লাল
দলে > দলে দলে

৫.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. "মনে কর, তুমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছ হনহনিয়ে। তোমার পায়ের কাছ দিয়ে সড়সড় করে চলে গেল একটা সাপ! ভয়ে তোমার গা ছমছম করে উঠল। মাথা ঘুরে উঠল বনবন করে। তুমি ভেউ ভেউ করে না কেঁদে খাঁ খাঁ রোদ্দুরেই শাঁ শাঁ করে দৌড়ে বাড়ি চলে এলে।"

– এই অনুচ্ছেদে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি সেগুলো নির্দেশ কর এবং এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে তুমিও একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

২. "দিন দিন চাষের জমি–জমা কমছে। বন-টন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মাঠে-মাঠে ফসল নেই। বনে-বনে জীব-জন্তু নেই। বছর–বছর লোকজন বাড়ছে। বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, কল-কারখানা হচ্ছে। খাল-বিল, পুকুর-টুকুর দখল ও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবেশ ও ভবিষ্যতের জন্যে এটি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।"

– উপরের অনুচ্ছেদে বিভিন্ন রকম দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোনটি কোন ধরনের দ্বিরুক্ত শব্দ প্রয়োগ লক্ষ করে অর্থসহ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাক্য

৬. বাক্য

৬.১ বাক্যগঠনের শর্ত : আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা

৬.২ খণ্ডবাক্য: স্বাধীন ও অধীন খণ্ডবাক্য

৬.৩ সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন

৬.৪ কর্ম-অনুশীলন

৬. বাক্য

এক বা একাধিক পদের দ্বারা যখন বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন :

লেখ।

আমি খাই।

কাজী সব্যসাচী বই পড়েন।

বাক্যের পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক বা অন্বয় থাকতে হয়, যার কারণে বক্তার মনোভাব বা বক্তব্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

লক্ষ কর :

গিয়ে পুকুরে বড় ধরেছি একটা মাছ।

খাঁ খাঁ অপু যাওয়ায় চলে করছে বাড়িটা।

বাক্য দুটোতে বক্তার মনোভাব পরিষ্কার নয়। কেননা, পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অন্বয় নেই। পদগুলো সুবিন্যস্ত নয়। তাই এগুলোকে বাক্য বলা যায় না। বাক্য হতে হলে পদগুলো সুবিন্যস্তভাবে সাজাতে হবে। যেমন :

পুকুরে গিয়ে বড় একটা মাছ ধরেছি।

অপু চলে যাওয়ায় বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।

সাধারণত কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ নিয়ে বাক্য গঠিত হয়। তবে একটি বাক্যকে সার্থক করে তুলতে আরও কতকগুলো গুণ বা শর্ত মানতে হয়।

৬.১ বাক্য গঠনের শর্ত : আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা

একটি আদর্শ বা সার্থক বাক্য তখনই গঠিত হবে যখন বাক্যটির তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে। এ গুণগুলো হচ্ছে:

১. আকাঙ্ক্ষা ২. আসত্তি ৩. যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পুরোপুরি বোঝার জন্য এক পদ শোনার পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছা বা আগ্রহকে **আকাঙ্ক্ষা** বলে। যেমন :

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া ...

বললে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। আরও কিছু বলার বাকি থাকে। আরো কিছু শোনার ইচ্ছা জাগে।

যদি বলা হয়–

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া করে। অথবা

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া করতো। অথবা

পলাশ মন দিয়ে লেখাপড়া করবে।

তবে শোনার ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়। আর এভাবে বাক্যও সম্পূর্ণ হয়।

২. আসত্তি : বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষা করে পদগুলোকে যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখার নাম আসত্তি। যেমন :

বাবা বাজার ইলিশ থেকে এনেছেন।

–এখানে বক্তা যা বলতে চেয়েছেন তার সব উপকরণ আছে। কিন্তু পদগুলো যথাযথভাবে সাজানো হয় নি। ফলে সুস্পষ্ট কোনো অর্থও প্রকাশ পায় নি। কিন্তু–

বাবা বাজার থেকে ইলিশ এনেছেন।

এভাবে লেখা হলে বক্তব্যটির অর্থ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে একটি সুগঠিত বাক্য হতো। তাই সার্থক বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর যথাযথ অবস্থানে থাকা আবশ্যক।

৩. যোগ্যতা : বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর মধ্যে অর্থের সংগতি ও ভাবের মিলবন্ধনকে **যোগ্যতা** বলে। যেমন :

আমরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরি।

এটি একটি সার্থক বাক্য। কেননা এখানে পদগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মিল রক্ষিত হয়ে তা বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু–

আমরা বড়শি দিয়ে নারকেল পাড়ি।

বললে বক্তব্যটিতে অর্থ ও ভাবের অসংগতি প্রকাশ পায়। তা বিশ্বাসযোগ্যও হয় না। কারণ বড়শি দিয়ে কেউ নারকেল পাড়ে না। সুতরাং বাক্যে পদগুলোর মধ্যে অর্থের সংগতি ও ভাবের মিল রক্ষা করা আবশ্যক। নয়তো যোগ্যতার অভাবে তা বাক্য হবে না।

৬.২ খণ্ডবাক্য: স্বাধীন খণ্ডবাক্য ও অধীন খণ্ডবাক্য

খণ্ডবাক্য

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে :

১. উদ্দেশ্য : বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে **উদ্দেশ্য** বলে। যেমন :

শিমুল মাঠে খেলতে গেল।

২. বিধেয় : বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে **বিধেয়** বলে। যেমন :

শিমুল **মাঠে খেলতে গেল**।

একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় ক্রিয়ার (সমাপিকা) সমষ্টি যদি নিজে একটি স্বাধীন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য কোনো বৃহত্তর বাক্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে **খণ্ডবাক্য** বলে। যেমন :

যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

—এ বাক্যে দুটি খণ্ডবাক্য আছে :

১. যারা ভালো ছেলে
২. তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

দুটি বাক্যই যেহেতু একটি বড় বাক্যের অংশ, সেহেতু বাক্যাংশ দুটি বড় বাক্যের খণ্ডবাক্য। খণ্ডবাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং তা অন্য একটি বাক্যের অংশরূপে ব্যবহৃত হয়।

খণ্ডবাক্য দু রকমের হয়। যথা : ১. স্বাধীন খণ্ডবাক্য ২. অধীন খণ্ডবাক্য

১. **স্বাধীন খণ্ডবাক্য** : একটি বড় বাক্যের অন্তর্গত যে খণ্ডবাক্য তার নিজের অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোনো খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাকে **স্বাধীন** বা **প্রধান খণ্ডবাক্য** বলে। যেমন :

যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

এ বাক্যের **'তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে'**— এ খণ্ডবাক্যটিকে আলাদা বাক্য হিসেবেও লেখা যেতে পারে। স্বাধীন খণ্ডবাক্যকে সম্পূর্ণ বাক্য থেকে তুলে নিয়ে আলাদাভাবে লিখলেও তার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়।

২. **অধীন খণ্ডবাক্য** : একটি বড় বাক্যের অন্তর্গত যে খণ্ডবাক্যটি তার অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য স্বাধীন খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভরশীল, তাকে **অধীন খণ্ডবাক্য** বা **আশ্রিত** বা **অপ্রধান খণ্ডবাক্য** বলে। অধীন খণ্ডবাক্যকে সম্পূর্ণ বাক্য থেকে তুলে নিয়ে আলাদাভাবে লিখলে তার পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না, আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। যেমন :

যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

এ বাক্যের **'যারা ভালো ছেলে'** খণ্ডবাক্যকে আলাদা করে লিখলে 'আকাঙ্ক্ষা' গুণের বিঘ্ন ঘটে।

অধীন খণ্ডবাক্য তিন রকমের :

ক. **বিশেষ্যস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য** : যে অধীন খণ্ডবাক্য স্বাধীন খণ্ডবাক্যের যেকোনো পদের অধীন থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য বলে। যেমন :

আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম, সবার খাওয়া হয়ে গেছে।

খ. **বিশেষণস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য** : যে অধীন খণ্ডবাক্য স্বাধীন খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য বলে। যেমন :

যে পরিশ্রম করে, **সে-ই** সুখ লাভ করে। (অধীন খণ্ডবাক্যটি 'সে-ই' সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)

গ. **ক্রিয়া-বিশেষণস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য** : যে অধীন খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষণস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য বলে। যেমন :

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

৬.৩ সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা :

১. সরল বাক্য
২. জটিল বাক্য
৩. যৌগিক বাক্য

১. **সরল বাক্য** : যে বাক্যে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটিই সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে, তাকে **সরল** বাক্য বলে। যেমন :

খোকন বই পড়ছে।
আমি বহু কষ্টে সাঁতার শিখেছি।
জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

২. **জটিল বাক্য** : যে বাক্যে একটি স্বাধীন বাক্য এবং এক বা একাধিক অধীন বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে **জটিল** বাক্য বা **মিশ্র** বাক্য বলে। যেমন :

যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।
তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করে আছি।

৩. **যৌগিক বাক্য** : দুই বা তার অধিক সরল বা জটিল বাক্য মিলিত হয়ে যদি একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তবে তাকে **যৌগিক বাক্য** বলে। যেমন :

ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী।
দুঃখ এবং বিপদ এক সাথে আসে।
এতক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু গাড়ি পেলাম না।

জটিল ও যৌগিক বাক্য একাধিক বাক্যাংশ বা বাক্য দিয়ে গঠিত।
জটিল বাক্যের অন্তর্গত বাক্যাংশগুলো পরস্পর সাপেক্ষ, একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল।

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলো প্রায় স্বতন্ত্র। ও, এবং, আর, অথচ, কিংবা, বরং ইত্যাদি অব্যয়যোগে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত খণ্ডবাক্যগুলো যুক্ত হয়। যেমন :

জটিল : যদিও লোকটি ধনী, তবুও সে কৃপণ।
যৌগিক : লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ।

জটিল : যদিও তাঁর টাকা আছে, তবু তিনি দান করেন না।
যৌগিক : তাঁর টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।

জটিল : যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক : বিপদ এবং দুঃখ একই সাথে আসে।

৬.৪ কর্ম-অনুশীলন

১. তোমার বাড়িতে ৩/৪ বছর বয়সের কোনো শিশু আছে? থাকলে (না থাকলে অন্য বাড়ির) তার আধো-আধো কথাগুলো মন দিয়ে শোনার ও বোঝার চেষ্টা কর। দেখবে সে অল্প কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে তার মনের সকল ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। সেগুলো তোমার কাছে অসংলগ্ন বা এলোমেলো ও হাস্যকর মনে হবে। তার এই এলোমেলো কথাগুলো তোমার বিবেচনায় বাক্যের কোনো গুণ বা লক্ষণ ব্যাহত করেছে? আধো-আধো কথা বলা কোনো শিশুর কিছু অসংলগ্ন হাস্যকর কথার উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর। (এটি একটি দলবন্ধ কাজও হতে পারে।)

২. নিচের বাক্যগুলোতে গঠনগত দিক থেকে কোন কোন গুণের অভাব ঘটেছে খাতায় লেখ :

ক. কাল আমি যাব ট্রেনে বাড়ি করে।

খ. সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয়।

গ. মন দিয়ে কর সবে...।

৩. একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে এমন দশটি বাক্য লেখ। এরপর সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাক্যটির কোনো অংশকে জটিল বাক্যে রূপান্তর কর। তারপর যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগে বাক্যটিকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর কর। যেমন :

তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয় নি।

জটিল বাক্য : তার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয় নি।

যৌগিক বাক্য : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিরামচিহ্ন

৭.১ বিরামচিহ্ন
৭.২ কমা, সেমিকোলন, কোলন ও হাইফেনের ব্যবহার
৭.৩ কর্ম-অনুশীলন

৭.১ বিরামচিহ্ন

মানুষ একটানা কথা বলতে পারে না। তাই তাকে মাঝে মাঝে থামতে হয়। তা ছাড়া অন্যকে কথাগুলো বোঝার সময়ও দিতে হয়। লেখার বেলায়ও তেমনি মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়। কথা থামাতে হয় শ্বাস নেবার জন্য। লেখা থামাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় নানা রকম চিহ্ন বা সংকেত। এই চিহ্ন বা সংকেতই **বিরামচিহ্ন**। একে যতি বা ছেদ-চিহ্নও বলা হয়ে থাকে। বিরামচিহ্ন ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয়।

লিখিত বাক্যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করার জন্য যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় তাকে বিরামচিহ্ন বলে।

নিচে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বিরামচিহ্নের নাম, আকৃতি নির্দেশ করা হলো :

বিরামচিহ্নের নাম	আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দাঁড়ি	।
জিজ্ঞাসাচিহ্ন	?
বিস্ময়চিহ্ন	!
কোলন	:
কোলন ড্যাশ	:–
ড্যাশ	–

হাইফেন	-
উদ্ধরণচিহ্ন / উদ্ধৃতিচিহ্ন	“ ”
বন্ধনী চিহ্ন	( ), { }, [ ]
বিকল্প চিহ্ন	/
ইলেক / লোপচিহ্ন / ঊর্ধ্বকমা	’

উল্লিখিত বিরামচিহ্নগুলোর মধ্যে কিছু চিহ্ন বক্তার মনোভাবের সমাপ্তি বোঝাতে বাক্যের শেষে বসে। কিছু চিহ্ন বক্তার মনোভাবের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে বাক্যের মধ্যে বসে।

বাক্যের শেষে ব্যবহৃত বিরামচিহ্নগুলো হচ্ছে : দাঁড়ি (।), জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) ও বিস্ময়চিহ্ন (!)।

দাঁড়ি (।)

বক্তার বা লেখকের মনোভাবের সমাপ্তি বোঝাতে বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে। যেমন :

আমরা বাংলাদেশে বাস করি।

জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?)

বক্তার মনে কোনো কিছু জানার আগ্রহ জন্মালে তা জানতে বাক্যের শেষে জিজ্ঞাসাচিহ্ন বা প্রশ্নচিহ্ন বসে। যেমন :

তোমার নাম কী?

বিস্ময়চিহ্ন (!)

বক্তার মনের বিভিন্ন আবেগ যেমন : আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ করতে এবং সম্বোধন পদের পরে বিস্ময়চিহ্ন বা সম্বোধনচিহ্ন বসে। যেমন :

১. আহা! কী সুন্দর দৃশ্য!
২. মাগো! তুমি কখন এলে!

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিরাম-চিহ্নগুলো হচ্ছে : কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), হাইফেন (-), ড্যাশ (–), ঊর্ধ্বকমা (’), উদ্ধৃতিচিহ্ন (“ ”), বিকল্প চিহ্ন (/)।

৭.২ কমা, সেমিকোলন, কোলন ও হাইফেনের ব্যবহার

কমা (,)

বাক্যে অল্প বিরতি বোঝাতে কমা বসে। নানা প্রয়োজনে বাক্যে কমাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য কমা বসে। যেমন :

তুমি যাবে, না যাবে না?

সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

২. বাক্যে সম্বোধনের পর কমা বসে। যেমন :

সেতু, পড়তে বসো।

বিথু, খাবে এসো।

৩. একই পদের একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে কমা বসে। যেমন :

বিশেষ্য : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী।

বিশেষণ : সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা একই মালার ফুল।

সর্বনাম : তুমি, আমি ও রবিন বাজারে যাব।

৪. একই ধরনের একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশকে আলাদা করতে কমা বসে। যেমন :

শ্রেষ্ঠা ক্লাসে ঢুকল, বই রাখল, তারপর বেরিয়ে গেল।

আমাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ খুবই আনন্দের দিন ।

৫. বাক্যে উদ্ধৃতিচিহ্নের আগে কমা বসে। যেমন :

মা বললেন, "অঙ্ক করতে বসো।"

আমি বললাম, "গল্পের বই পড়তেই ভালো লাগছে।"

সেমিকোলন (;)

একাধিক বাক্যের মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকলে তাদের মাঝে যোগসূত্র রক্ষার জন্য সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়। সেমিকোলনচিহ্ন কমার চেয়ে দ্বিগুণ সময় বিরতি নেয়। যেমন :

১. দুটো বাক্যের মধ্যে ভাব বা অর্থের সম্বন্ধ থাকলে সেমিকোলন বসে। যেমন :

দিনটা ভালো নয়; মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে।

কথাটা বলা সহজ; করা কঠিন।

২. একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত না হলে সেমিকোলন বসে। যেমন :

আগে স্কুলের পড়া; পরে গল্পের বই।

৩. যেসব অব্যয় বৈপরীত্য বা অনুমান প্রকাশ করে, তাদের আগে সেমিকোলন বসে। যেমন :

মনোযোগ দিয়ে পড়; তাহলেই ভালো ফল করবে।

ছেলেটি মেধাবী; কিন্তু ভারি অলস।

কোলন (:)

বাক্যে নানা কারণে কোলনচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে :

বাংলা সন্ধি দু প্রকার : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

২. উদ্ধৃতির আগে :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"

৩. নাটকের সংলাপের আগে :

দুকড়ি : কী চাই?

কাঙালি : আজ্ঞে, মহাশয় হচ্ছেন দেশহিতৈষী।

দুকড়ি : তা তো সকলেই জানে কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?

কাঙালি : আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—

হাইফেন (-)

হাইফেনকে বাংলায় সংযোগ চিহ্ন বলা হয়। বিভিন্ন কারণে বাক্যে হাইফেনের ব্যবহার হয়। যেমন :

১. দুটো শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন বসে। যেমন :

আমার মা-বাবা বেড়াতে গেছেন।

পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ বিবেক দিয়ে বুঝতে হয়।

২. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেন বসে। যেমন :

আমাদের প্রীতি-উপহার গ্রহণ করুন।

তাদের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক।

৩. একই ধরনের শব্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে হাইফেন বসে। যেমন :

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ।

ঢাকা-খুলনা-বরিশাল এ দেশের বড় শহর।

৭.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে বিরামচিহ্ন বসাও :

ক. আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা হাতপাখা ফুলপিঠা তৈরি করা হয় তা মোটেই অবহেলার সামগ্রী নয়

খ. যুবক বলিল কি সে কাজ আমি কি তাহা জানিতে পারি না কৃপা করিয়া আমাকে তাহা জানিতে দাও অভিন্ন হৃদয় সুহৃদের ন্যায় প্রাণ দিয়াও আমি সে কার্যে তোমার সহায়তা করিব

গ. মুক্তি বলল স্যার বলেছেন আজ ক্লাসে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা নিয়ে গল্প শোনাবেন

আমি বললাম তিনি কি কোনো বই পড়ে আসতে বলেছিলেন

মুক্তি বলল তুমি গত ক্লাসে আসনি কেন ক্লাস না করলে কত কথা জানা যায় না বুঝেছ

আমি উত্তর দিলাম সে দিন আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম

এবার মুক্তি বলল স্যার আজ আমাদের কোনো বই পড়ে আসার কথা বলে দেন নি

২. বাক্যে কোথায় কোথায় ড্যাশ ও হাইফেন বসে দৃষ্টান্তসহ উপস্থাপন কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বানান

৮. বানান

৮.১ বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

৮.২ কর্ম-অনুশীলন

৮. বানান

ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে হলে সে ভাষার বানান জানা খুব জরুরি। প্রত্যেক ভাষারই বানানের নিয়ম আছে। বাংলা ভাষার বানানেরও বিশেষ কিছু নিয়ম রয়েছে। এই নিয়ম সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আধুনিক করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণভাবে মান্য করা হয় বাংলা একাডেমি অনুমোদিত বানানরীতি। নিচে বাংলা বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম দেখানো হলো।

৮.১ বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

ক. বানানে ই ঈ, উ ঊ-এর ব্যবহার

১. যেসব তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর (ই ঈ, উ ঊ) অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র) শব্দের বানানে হ্রস্বস্বর (ই ি, উ ু) হবে। যেমন :

তৎসম শব্দে :

অঞ্জুরি, অটবি, আবির, আশিস্, উষা, কিংবদন্তি, কুটির, গন্ডি, গ্রন্থাবলি, চিৎকার, তরণি, তরি, দেশি, পদবি, বিদেশি, ভ্রু, শ্রেণি, সারণি।

অতৎসম শব্দে :

আদমি, আপিল, আমিন, আলমারি, উকিল, উর্দু, কাজি, কারবারি, কারিগরি, কুমির, কেরানি, খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ, গরিব, গাজি, গাড়ি, গিন্নি, চাকরি, জরুরি, জানুয়ারি, ডিগ্রি, দরকারি, দাবি, দিঘি, ধুলো, নার্সারি, পড়শি, পদবি, বাড়ি, বাঁশি, বাঙালি, বে-আইনি, ভুতুড়ে, মিস্ত্রি, মুলো, মেয়েলি, যিশু, রেশমি, লটারি, লাইব্রেরি, শাশুড়ি, শিকারি, সবজি, সরকারি, সুন্নি, হাজি, হিজরি।

২. কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন :

অভিনেত্রী, কর্ত্রী, কল্যাণী, কিশোরী, গাভী, গুণবতী, চন্ডী, চতুর্দশী, ছাত্রী, জননী, তরুণী, দাসী, দুঃখিনী, দেবী, নারী, পত্নী, পিশাচী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী, মাতামহী, মানবী, যুবতী, লক্ষ্মী, শ্রীমতী, সতী, সরস্বতী, হরিণী, হৈমন্তী।

৩. ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই–কার হবে। যেমন :

আফগানি, আরবি, ইংরেজি, ইরাকি, ইরানি, ইহুদি, কাশ্মিরি, জাপানি, তুর্কি, নেপালি, পাকিস্তানি, পাঞ্জাবি, ফরাসি, বাঙালি, সাঁওতালি, সিন্ধি, হিন্দি।

৪. বিশেষণবাচক 'আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন :
চৈতালি, পুবালি, বর্ণালি, মিতালি, মেয়েলি, রুপালি, সোনালি।

খ. বানানে ও-এর ব্যবহার

১. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও–কার (ো) অপরিহার্য নয়। যেমন :
আনব, করত, খেলব, চলব, দেখত, ধরব, নাচব, পড়ব, বলত, মরব, মরাব, লড়ব, লিখব।

২. বর্তমান অনুজ্ঞার সামান্যরূপে পদান্তে ও–কার প্রদান করা যায়। যেমন :
আনো, করো, খেলো, চলো, দেখো, ধরো, নাচো, পড়ো, বলো, মারো, লড়ো, লেখো।

৩. 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার হবে। যেমন :
করানো, খাওয়ানো, ঠ্যাঙানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, শোয়ানো।

৪. অর্থ বা উচ্চারণ বিভ্রান্তির সুযোগ থাকলে কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দে ও-কার দেওয়া আবশ্যক। যেমন :

কাল (সময়), কালো (কৃষ্ণ বর্ণ);
কোন (কী, কে, কোনটি), কোনো (বহুর মধ্যে এক);
ভাল (কপাল), ভালো (উত্তম)।

গ. বানানে বিসর্গ (ঃ)-এর ব্যবহার

১. পদান্তে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন :
ক্রমশ, দ্বিতীয়ত, প্রথমত, প্রধানত, বস্তুত, মূলত।

২. পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। যেমন :
অন্তঃস্থ, দুঃখ, দুঃসহ, নিঃশব্দ, পুনঃপুন, স্বতঃস্ফূর্ত।

৩. অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন :
দুস্থ, নিশ্বাস, নিস্পৃহ, বহিস্থ, মনস্থ।

ঘ. বানানে মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন-এর ব্যবহার

১. যুক্তব্যঞ্জনে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গীয় বর্ণের (ট ঠ ড ঢ) পূর্ববর্তী দন্ত্য–ন ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট, বণ্টন, অকুণ্ঠ, আকণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, উপকণ্ঠ, কণ্ঠ, কণ্ঠনালি, লুণ্ঠন, অকালকুষ্মাণ্ড, অণ্ড, কাণ্ড, কাণ্ডারী, কুণ্ডল, খণ্ড, চণ্ডী, দণ্ড, পণ্ডিত, ভণ্ড, ভণ্ডামি।

২. তৎসম শব্দে ঋ, ঋ-কার (ৃ), র, র-ফলা (্র), রেফ (র্), ষ, ক্ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
ঋণ, তৃণ, অরণ্য, ত্রাণ, বর্ণ, বিদূষণ, বিশেষণ, ক্ষণ, ক্ষণিক।

৩. একই শব্দের মধ্যে ঋ, ঋ-কার, র, র-ফলা, রেফ, ষ, ক্ষ-এর যে কোনোটির পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ এবং য, য়, হ, অনুস্বার (ং), – এই বর্ণগুলোর একটি বা একাধিক বর্ণ থাকলেও পরবর্তী ন-ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
কৃপণ, নিরূপণ, অগ্রহায়ণ, অকর্মণ্য, নির্বাণ, সর্বাঙ্গীণ, অপেক্ষমাণ, বক্ষ্যমাণ।

৪. প্র, পরা, পরি, নির- এই চারটি উপসর্গের পর নম্, নশ্, নী, নু, অন্, হন্ প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য–ন স্থলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :
প্র : প্রণাম, প্রণব, প্রণীত, প্রণিপাত;
পরা : পরায়ণ, পরাহ্ণ;
পরি : পরিণতি, পরিণাম, পরিণয়;
নির : নির্ণীত, নির্ণয়, নির্ণায়ক।

৫. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (অতৎসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য–ন হয়। যেমন :
ইন্টার, উইন্টার, কারেন্ট, গ্র্যান্ড, টেন্ডার, প্যান্ট, ব্যান্ড, লন্ডন, সেন্ট্রাল।

৬. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন হয়। যেমন :
অনন্ত, অন্তরঙ্গ, একান্ত, ক্লান্ত, জ্বলন্ত, মন্ত্রী, গ্রন্থ, পান্থ, অনিন্দ্য, পরান্ন, প্রচ্ছন্ন, রান্না, সান্নিধ্য।

৭. সন্ধি ও সমাসযোগে গঠিত শব্দের বানানে দন্ত্য–ন বহাল থাকে। যেমন :
অগ্রনায়ক, অহর্নিশ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি, নির্নিমেষ, শিক্ষাঙ্গন।

৮. তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দে সর্বত্র দন্ত্য–ন হবে। যেমন :
আপন, আয়রন, কুর্নিশ, কোরান, গ্রিন, চিরুনি, ঝরনা, ধরন, বার্নিশ, মেরুন, লণ্ঠন, শিহরন, হর্ন।

২০২৫

ঙ. বানানে মূর্ধন্য-ষ-এর ব্যবহার

১. ঋ কিংবা ঋ–কার (ৃ)-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
ঋষি, কৃষি, কৃষক, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, তৃষিত, দৃষ্টি, সৃষ্টি, হৃষ্টচিত্ত।

২. র–ধ্বনি রেফ (́)-এর রূপ নিয়ে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের মাথায় বসলে ঐ ব্যঞ্জনের পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
আকর্ষণ, ঈর্ষা, উৎকর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, শীর্ষ, সন্তর্ষি, হর্ষ।

৩. অ, আ ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ এবং ক্, র্ বর্ণের পরবর্তী দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
ঈষৎ, উষা, এষণা, কোষ, জিগীষা, বিষম, ভবিষ্যৎ, রোষ, সুষমা।

৪. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
সঙ্গ> অনুষঙ্গ, সেক> অভিষেক, স্থান> অধিষ্ঠান, সুপ্ত> সুষুপ্ত।

৫. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম শব্দে) ট-বর্গের পূর্বে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন :
অনিষ্ট, অষ্টম, আড়ষ্ট, উচ্ছিষ্ট, উপদেষ্টা, কষ্ট, চেষ্টা, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠা, ভূমিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, সুষ্ঠু।

৬. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-স হয়। যেমন :
অধস্তন, ইস্তফা, উদ্বাস্তু, ওস্তাদ, কস্তুরি, কাস্তে, জবরদস্তি, স্থান, স্থানীয়, স্বাস্থ্য।

৭. যুক্তব্যঞ্জন গঠনে (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) চ-বর্গের পূর্বে তালব্য-শ হয়। যেমন :
আশ্চর্য, দুশ্চরিত্র, নিশ্চয়, পশ্চাৎ, প্রায়শ্চিত্ত, বৃশ্চিক, নিশ্ছিদ্র।

চ. বানানে রেফ (́)–এর ব্যবহার

রেফ-এর পর কোথাও (তৎসম, অতৎসম সকল শব্দে) ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন :
কর্জ, কর্ম, কার্য, পূর্ব, ফর্দ, মর্মর, শর্ত, সূর্য।

ছ. বানানে ঙ / ং-এর ব্যবহার

১. সন্ধিতে (তৎসম শব্দে) প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং (অনুস্বার) হবে। যেমন :
অহংকার (অহম্ +কার), কিংকর, কিংবদন্তি, ঝংকার, ভয়ংকর, সংকল্প, সংকীর্ণ, সংগীত, সংঘ, সংঘাত, হুংকার।

২. উপর্যুক্ত নিয়মে সন্ধিজাত না হলে, যুক্তব্যঞ্জনে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ঙ (উয়ো)) হবে। যেমন :
আকাঙ্ক্ষা, অঙ্কুর, অঙ্গ, ইঙ্গিত, উচ্ছৃঙ্খল, কঙ্কাল, কাঙ্ক্ষিত, গঙ্গা, জঙ্গি, দাঙ্গা, পঙ্কজ, পঙ্গু, বঙ্গ, ভঙ্গি, লঙ্ঘন, শিক্ষাঙ্গন, সঙ্গী।

৩. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে ং (অনুস্বার) ব্যবহৃত হয়। যেমন :
আড়ং, ইদানীং, এবং, ঠ্যাং, ঢং, পালং, ফড়িং, বরং, রং, শিং।

৪. তবে অনুস্বারযুক্ত শব্দে প্রত্যয়, বিভক্তি বা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে ং স্থলে ঙ লেখা হবে। যেমন :
আড়ঙে, টঙে, ঢঙে, ফড়িঙের, রঙিন, রাঙিয়ে, সঙের।

৮.২ কর্ম–অনুশীলন

১. আসাঢ়ে বৃষ্টি হয়। অতি বৃষ্টির পাণি পরিনামে বয়ে আনে বন্যা। লোকের কস্ট বাড়ে। দেখা দেয় বিভিন্ন রোগের প্রদুঃভাব। চলাচল দুস্কর হয়ে পড়ে।

–এই বাক্যগুলো থেকে ভুল বানানগুলো খুঁজে বের কর। সেগুলো কোন কারণে ভুল তা উল্লেখ করে শুদ্ধ বানান লেখ।

২. তোমার পাঠ্যবইয়ের যে-কোনো একটি গল্প খুব ভালো করে পড়। তারপর গল্পটি থেকে যেসব বানানে ই, উ-কার এবং যেসব স্ত্রীবাচক শব্দে ঈ-কার পাওয়া যায় সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর। (এটি তুমি একটি গ্রুপ তৈরি করেও করতে পার।)

নবম পরিচ্ছেদ

অভিধান

৯. অভিধান

৯.১ বর্ণানুক্রম

৯.২ ভুক্তি ও শীর্ষ শব্দ

৯.৩ কর্ম-অনুশীলন

৯. অভিধান

ইংরেজি Dictionary শব্দটির বাংলা অর্থ 'অভিধান'। অভিধান হলো ভাষার সেই গ্রন্থ, যা থেকে ঐ ভাষার শব্দসমূহ, শব্দের অর্থ, উৎস, ব্যুৎপত্তি, পদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। অভিধান জানিয়ে দেয় শব্দের শুদ্ধ রূপ কোনটি, শুদ্ধ বানান কোনটি, শুদ্ধ অর্থ কোনটি। অভিধান মানেই হচ্ছে শুদ্ধতার প্রতীক। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষারই অভিধান বা শব্দকোষ আছে। বাংলা ভাষায়ও সংকলিত হয়েছে সমৃদ্ধ অভিধান।

৯.১ বর্ণানুক্রম

অভিধানে শব্দের পর শব্দ সাজানো থাকে বর্ণানুক্রমিকভাবে। প্রথমে অ দিয়ে যেসব শব্দের বানান শুরু, সেগুলো। তারপর আ দিয়ে, তারপর ই দিয়ে; এভাবে বর্ণের ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে অভিধান। তবে সাধারণভাবে বর্ণের যে ক্রম মান্য করা হয় তা থেকে অভিধানে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিচে অভিধানে অন্তর্ভুক্ত শব্দের বর্ণানুক্রম দেখানো হলো।

সাধারণ বর্ণানুক্রম

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স

হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

অভিধানে ব্যবহৃত বর্ণানুক্রম

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ

ক ক্ষ খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত (ৎ) থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

যুক্তাক্ষরের বর্ণানুক্রম

ক্ক ক্ট ক্ত ক্ষ ক্স গ্ণ গ্ধ ঙ্ক ঙ্ক্ষ ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ

চ্চ চ্ছ চ্ঞ জ্জ জ্ঝ জ্ঞ ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ

ট্ট ড্ড ড়্গ ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ ণ্ম ত্ত ত্থ

দ্গ দ্ঘ দ্দ দ্ধ দ্ব দ্ভ ধ্ব ন্ট ন্ঠ ন্ড ন্ঢ

ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন ন্ম প্ট প্ত প্প প্স ব্জ ব্দ

ব্ধ ব্ব ব্ভ ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম ল্ক ল্গ ল্ট

ল্ড ল্প ল্ম ল্ল শ্চ শ্ছ ষ্ক ষ্ট ষ্ঠ ষ্ণ ষ্প ষ্ফ

ষ্ম স্ক স্ট স্ত স্থ স্প স্ফ হ্ণ হ্ন হ্ম

কার চিহ্ন া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ

ফলাচিহ্ন ন/ণ ম য র ল ব

স্বরবর্ণ, কারচিহ্ন, অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর বিন্যাসের নমুনা

ক কঅ কআ কই কঈ কউ কঊ কঋ কএ কঐ কও কঔ কং কঃ কঁ কঁক কঁখ ...

কা কাঅ কাআ কাই কাঈ কাউ কাঊ কাঋ কাএ কাঐ কাও কাঔ কাং কাঃ কাঁ কাঁক কাঁখ...

৯.২ ভুক্তি ও শীর্ষ শব্দ

অভিধানে যে শব্দের অর্থ দেওয়া হয়, সেটি বোল্ড টাইপে বা মোটা হরফে মুদ্রিত থাকে। এটিকে শীর্ষ শব্দ বলে। যেমন :

অঋণী [অরিনি] *বিণ* ঋণমুক্ত; ঋণশূন্য। {স. অ+ঋণ+ইন(ইনি); স. অনৃণী}

—এখানে 'অঋণী' শব্দটি হচ্ছে শীর্ষ শব্দ।

অভিধানে শীর্ষ শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা ও ব্যবহার যেভাবে বিধৃত থাকে তাকে বলা হয় ভুক্তি। শীর্ষ শব্দগুলো যাতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, সেজন্যে অভিধানে শব্দগুলোকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো থাকে। বাংলা একাডেমি যে "অভিধান ব্যবহার নির্দেশিকা" প্রণয়ন করেছে তা এ রকম :

অভিধান ব্যবহার নির্দেশিকা

এ অভিধানে শব্দের উচ্চারণ, অর্থ, পদ পরিচয়, অর্থান্তর, প্রয়োগ, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি কীভাবে নির্দেশ করা হয়েছে নিম্নলিখিত নির্দেশিকায় তা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হলো :

২০২৩

শীর্ষশব্দ
উচ্চারণ

অবশিষ্ট [অবোশিশটো] বিণ ১ বাকি। ২উদ্বৃত্ত। ৩ অতিরিক্ত। {স. অব+√শিষ্+ত(ক্ত)}

সাধারণ অর্থ

বিকল্প শীর্ষশব্দ
পদ পরিচয়

খেত, ক্ষেত [খেত] বি মাঠ; চাষের জমি; শস্যোৎপাদনের মাঠ (চাচ্ তারা, ফসলের খেত, দীঘি ও খামার—বিদে) ~খোলা, ~খামার বি আবাদি জমি; চাষের কর্মক্ষেত্র (এক গেলাস চাউল- পানি খাইয়া খেত-খোলা দেখিতে বাহির হওয়া ওসমান সরকারের অনেক দিনের অভ্যাস—আমজা)। **খেতালি, খেতি, ক্ষেতি** বি ১ চাষ-আবাদ (...বিবিধ ক্ষেত ক্ষেতি শোভয়—সৌবা)। ২ ক্ষেত কর্ষণের বা চাষ-আবাদের কাজ। {স. ক্ষেত্র>প্রা. খেত্ত>খেত}

উপভুক্তি
প্রয়োগবাক্য

অভিন্ন বানানের
একাধিক ভুক্তি

তর[১] [তর] বিণ ১ বিভোর; নিমগ্ন; চুর (এই শরাবের পিয়ালা দিয়ে তর করি দিলু—নই) ।২ জলসিক্ত; ভিজে যাওয়া (ভিজে তর হয়ে যাওয়া)। {ফা. তর্ تر }
তর[২] [তর] বি বিলম্ব; দেরি; অপেক্ষা (তর সহেনাক একটি তিল— আয়োকা; তর সয় না বর, দিনেই বিয়া কর— ছড়া)। {স. ত্বরা>}
তর[৩] **তরো** [তরো]. বিণ প্রকারের; ধরনের; শ্রেণির (কেমনতর লোক)। **তরো-বেতরো** বিণ বিভিন্ন প্রকারের; নানা ধরনের; হরেক রকম (আলোর নিশেন ঝুলছে—চৌকো লম্বা চওড়া সরু তরো-বেতরো—অঠা)। **বে-** বিণ খারাপ ধরনের; খারাপ; দুষ্ট বেয়াড়া। {আ. তরহ طرح }

ব্যুৎপত্তি

অধীন [ওধিন] বিণ ১ আয়ত্ত; বশীভূত (আজ্ঞার অধীন)। ২ অন্তর্গত; অন্তর্ভুক্ত (শাসনের অধীন)। ৩ অনুগত; বাধ্য (অধীন জন)। ☐বি ১ অধীন ব্যক্তি (অধীনের বিনীত নিবেদন)। ২ নিয়ন্ত্রণ; তত্ত্বাবধান (তাঁর অধীনে আমি কাজ করি)। **অধীনতা** বি আজ্ঞানুবর্তিতা; পরাধীনতা। **অধীনা, অধিনী. অধীনী** বিণ আশ্রিতা; বশীভূতা; অনুগতা (তুমি নব জলধর এ তব অধিনী—মদ, তাইতো কাঁদায় নিশিদিনই এ অধীনী—নই)। {স. অধি + ইন(খ)}

অর্থান্তর সংখ্যা
পদান্তর সংকেত
প্রত্যয়
উৎস- ভাষা নির্দেশ

দর্জি ⇒ দরজি

দ্রষ্টব্য

নিদ = নিদ্রা

অভিন্নতা নির্দেশক

বানানো [বানানো] ক্রি ১ তৈরি করা; গড়া; প্রস্তুত করা (বাড়ি বানানো শেষ হয়েছে)। ২ রাঁধা (রুটি বানানো; কোর্মা বানানো)। ৩ রাঁধবার জন্য কোনো কিছু কোটা (মাংস বানানো, তরকারি বানানো)। ৪ কোনো কিছুর সঙ্গে তুল্য জ্ঞান করা (ভেড়া বানানো)। ৫ কিছুতে পরিণত করা (বোকা বানানো)। ☐বিণ কৃত্রিম; মিথ্যা। {তুল. হি. বনানা; ক্রিয়ার রূপ—বানাই, বানাও, বানান, বানাবে, বানিয়ে ইত্যাদি; অসমাপিকার রূপ—বানিয়ে বানাতে ইত্যাদি}

ক্রিয়ার রূপ

পরপদ [পরোপদ] বি ১ শ্রেষ্ঠ স্থান; পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ। ২ মোক্ষ। ৩ (ব্যা.) সমাসে সমস্যমান পদদুটোর মধ্যে পরেরটি বা দ্বিতীয়টি (শ্রেষ্ঠধন—এখানে 'ধন' দ্বিতীয় পদ)। {স. পর+পদ; ৬তৎ}

বিবর নির্দেশ
ব্যাকরণ নির্দেশ

৯.৩ কর্ম-অনুশীলন

১. তোমার হাতের কাছে যে অভিধান আছে সেটি দেখে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়', 'দেউলিয়া', 'রকমারি' ও 'সরঃ' শীর্ষ শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা ও ব্যবহার লেখ।

২. হিসাব, হিস্‌সা, আছাড়, আচ্ছাদক, খাকি, খাঁটি, ড্রপার, ড্যাশ, উৎপাদন, উতরাই, চিরুনি, চিরায়ু, সাম্য, সামান্য, ফলদ, ফলার, ইক্ষু, ইঁদুর, প্রসাধন, প্রশাখা – শব্দগুলোকে অভিধানের মতো বর্ণনানুক্রমিকভাবে সাজাও।

দশম পরিচ্ছেদ

শব্দার্থ

১০. শব্দার্থ

১০.১ একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে বাক্য রচনা

১০.২ সমার্থক শব্দের প্রয়োগে বাক্য রচনা

১০.৩ বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা

১০.৪ বাগ্‌ধারা

১০.৫ কর্ম-অনুশীলন

১০. শব্দার্থ

অর্থপূর্ণ শব্দের দ্বারা মানুষ পারস্পরিক ভাবের আদান–প্রদান করে। আর অর্থ হচ্ছে শব্দের প্রাণ।

ভাষার ভাব (বাক্য, বাক্যাংশ, রূপ, শব্দ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি) যখন ইন্দ্রিয় (প্রধানত চোখ, কান) গ্রহণ করে এবং তার উপরে যে মানসিক ধারণা জন্মায়, তখন তাকে শব্দার্থ বলে।

নানা কারণে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। নিচে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

১০.১ একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষায় কতগুলো শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া জাতীয় এই পদগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এগুলো একদিকে যেমন একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি বাক্যের সৌন্দর্য সাধন করে থাকে। যেমন :

১. কথা

উক্তি : রবীন্দ্রনাথের কথা, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

তর্ক : এই ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি : তোমাকে আমি কথা দিলাম।

প্রস্তাব : তোমার কথায় আমি রাজি।

তিরস্কার : পড়া না পারায় স্যারের কাছে কথা শুনতে হলো।

প্রসঙ্গক্রমে : কথায় কথায় তোমার নামটি এসে গেল।

২. কান

শ্রবণ অঙ্গ : নোভা কানে দুল পরেছে।

বধির : লোকটি কানে শোনে না।

কর্ণগোচর : কথাটা বড় সাহেবের কানে পৌঁছেছে।

মনোযোগ : আমার কথায় কান দাও।

প্রকাশ : কথাটা পাঁচ কান করো না।

নির্লজ্জ : সানুর মতো দুকান কাটা লোক আর দেখি নি।

৩. কাঁচা

অপক্ক : আমটি কাঁচা হলেও বেশ মিষ্টি।

অসিদ্ধ : কাঁচা দুধ সবার হজম হয় না।

অপূর্ণ : আমার কাঁচা ঘুমটি ভাঙালে কেন?

অদক্ষ : কাঁচা লোক দিয়ে বাড়ি বানিয়ো না।

অশুষ্ক : কাঁচা কাঠে আগুন জ্বলে না।

অপরিণত : এই শক্ত কাজের জন্য ছেলেটি বড্ড কাঁচা।

দুর্বল : ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।

৪. কাটা

ক্ষত : কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিও না।

নষ্ট : পোকায় কাটা বইগুলো আর পড়ার মতো নেই।

চুরি : পরের গাঁট কাটা ওর স্বভাব।

ছোবল : সাপে কাটা লোকটিকে সবাই দেখতে এসেছে।

ছন্দপতন : তাল কাটা গান শুনতে ভালো লাগে নাকি?

৫. খাওয়া

ভোজন : আমার খাওয়া হয়েছে।

ঘুষ : মনির সাহেবকে সবাই টাকা খাওয়া অফিসার হিসেবেই চেনে।

বাধা : কাজের শুরুতেই ধাক্কা খাওয়া ভালো লক্ষণ নয়।

দিব্যি : মাথা খাও, এখন যেও না।

তিরস্কার : শিক্ষকের কাছে ধমক খাওয়া বিথুর নিত্যদিনের অভ্যাস।

২০২৫ মানিয়ে চলা : সংসারে সবার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়।

৬. গরম

উষ্ণ : এক কাপ খুব গরম চা দাও।

গ্রীষ্ম : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গরমকাল।

উগ্র : তোমার গরম মেজাজকে আমি ভয় পাই না।

অহংকার : দু নম্বরি টাকার গরমে রহিমের পা যেন মাটিতে পড়ে না।

চড়া : সরবরাহ কম থাকলে বাজার গরম থাকে।

শীত নিবারক : শীতকালে গরম কাপড় না হলে চলে না।

৭. গা

শরীর : রোমানার গায়ের রং ফর্সা।

গ্রাহ্য : তার কোনো কথাই আমি গায়ে মাখি না।

ঈর্ষা : পরের ভালো দেখলে কারো কারো গা জ্বলে।

পরিধান : গায়ে নতুন জামা দেখছি, কবে কিনলে?

আত্মগোপন : পুলিশ দেখে চোরটি গা-ঢাকা দিল।

অভ্যস্ত : মাস্তানদের দৌরাত্ম্য এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।

৮. গলা

গ্রীবা : চিড়িয়াখানায় লম্বা গলার জিরাফ দেখেছি।

কণ্ঠ : তার সুরেলা গলার গান ভোলা যায় না।

প্রীতির ভাব : ওদের দুজনের বেশ গলায় গলায় ভাব।

অতি বিনয় : গলবস্ত্র হয়ে রতনবাবু সাহায্য চাইলেন।

বোঝা : পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই।

অপমান : লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।

৯. চাল

তণ্ডুল : ঘরে চাল বাড়ন্ত, খাবে কী?

ঘরের ছাদ : ফুটো চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে।

আচার-ব্যবহার : তার চাল-চলন মোটেই ভালো নয়।

মতলব : সেলিম খুব গভীর জলের মাছ, তার চাল বোঝা কঠিন।

আড়ম্বর : রহিমের বাইরেই যত চাল, ভেতরে একেবারেই ফাঁপা।

ঘর-সংসার : চাল-চুলোর ঠিক নেই, তোমাকে মেয়ে দেবে কে?

২০২৫

১০. চোখ

আঁখি : আমরা চোখ দিয়ে দেখি।
দৃষ্টি : পুলিশের চোখ আসামির দিকে।
ফাঁকি : চোরটি পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গেল।
রোগ : রফিকের চোখ উঠেছে বলে ভীষণ কষ্টে আছে।
ভয় দেখানো : আমাকে চোখ রাঙিয়ে লাভ হবে না।
লজ্জা : তোমার চোখের চামড়া থাকলে আর আমার সামনে আসতে না।

১১. ছোট

কনিষ্ঠ : রবিন আমার ছোট ভাই।
নীচ : তোমার মতো ছোট মনের মানুষ আমি আর দুটো দেখি নি।
হীন : ছোট কাজ বলে কিছু নেই।
বিনীত : বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।
হেয় করা : জাতের কথা বলে কাউকে ছোট করা ঠিক না।

১২. ছাড়া

ত্যাগ : তার মতো সংসার ছাড়া লোক আমি আর দেখি নি।
মুক্তি : মাসুম আজই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।
শ্রীহীন : লক্ষ্মীছাড়া সংসারে ভালো কিছু চিন্তা করাই ভুল।
উচ্চস্বরে : গান শিখতে হলে ছাড়া গলায় প্রতিদিন রেওয়াজ করতে হবে।
ব্যতীত : সত্যের পথ ছাড়া মুক্তি নেই।

১৩. তাল

তবলার বোল : তবলায় তাল বেজেছে তাক ধিনা ধিন্ ধিন্।
ছন্দহীন : তাল কাটা গান ভালো লাগে না।
ফল বিশেষ : 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে, উঁকি মারে আকাশে।'
ধীরে : বাড়ি তৈরির কাজ ঢিমা তালে চলছে।
মানিয়ে চলা : সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলার মেয়ে মিনি নয়।

১৪. তোলা

উত্তোলন : ব্যাংক থেকে টাকা তোলা হয়েছে।
উত্থাপন : কথাটা আমার তোলার কথা না, তুমি বল।
সংগ্রহ : সরকার যেকোনো ধরনের চাঁদা তোলা নিষিদ্ধ করেছে।
ছেঁড়া : গাছ থেকে ফুল তুলো না।
গ্রাহ্য করা : সে আমার কথা কানেই তুলল না।

১৫. ধরা

আটক : চোরটাকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে।

স্পর্শ : তোমার হাতখানা একবার ধরতে চাই।

ভালো লাগা : তার গল্পটি আমার মনে ধরেছে।

নির্ধারণ : তুমি নিজে থেকে একটা দাম ধরে দাও।

তোষামুদে : সংসারে ধামাধরা লোকের অভাব নেই।

যন্ত্রণা : মাথাটা বড্ড ধরেছে।

১৬. নাক

নাসিকা : তিসা নাকে নথ পরেছে।

শব্দ করা : ঘুমের মধ্যে অনেকেই নাক ডাকে।

নিশ্চিন্ত : পরীক্ষা শেষ, এবার নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও।

ক্ষতি : নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে তোমার কী লাভ হলো?

অনধিকার চর্চা : আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

১৭. নাম

পরিচয় : তোমার নাম কী?

খ্যাতি : ক্রিকেট খেলে রাজন বেশ নাম করেছে।

খ্যাতিমান : তিনি একজন নামকরা উকিল।

স্মরণ : সব সময় সৃষ্টিকর্তার নাম নেবে।

স্বল্পমূল্য : নামমাত্র দামে বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল।

উল্লেখ : একটা নদীর নাম বল।

১৮. পাকা

পরিপক্ব : আমটি পাকা।

অকালপক্ব : ছেলেটির বয়স অল্প, কিন্তু কথায় পাকা।

নিপুণ : মিনা ইংরেজিতে পাকা।

দক্ষ : পাকা মিস্ত্রি দিয়ে বাড়ি বানিয়েছি।

স্থায়ী : কাপড়টির রং পাকা।

পুরোপুরি : পাকা চল্লিশ দিন স্কুল ছুটি।

১৯. বড়

অগ্রজ : রাম আমার বড় ভাই।

দীর্ঘ : পদ্মা বাংলাদেশের বড় নদী।

ধনী : লোকমান সাহেব বড়লোক।
অত্যন্ত : বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।
উন্নতি করা : বড় হও নিজের চেষ্টায়।
আত্মীয় : বাড়িতে বড় কুটুম এসেছে।

২০. বুক

বক্ষ : বাবার বুকে হঠাৎ ব্যথা উঠেছে।
সাহস : তোমার দেখছি খুব বুকের পাটা!
গর্ব : তোমার কৃতিত্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে।
শান্তি : এসির বাতাসে বুকটা জুড়িয়ে গেল।
হতাশ : রিতা ফেল করেছে শুনে তার বাবার বুকটা যেন ভেঙে গেল।
ভীষণ কষ্ট : বন্ধুর মৃত্যুর খবরে আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল।

২১. ভালো

কুশল : ভালো আছ তো?
মঙ্গল : ঈশ্বর সবার ভালো করুন।
সৎ : চৌধুরী সাহেব খুব ভালো লোক।
সুন্দর : মেয়েটির চেহারা এত ভালো যে কী বলব!
হিতবাক্য : ভালো কথা শুনলে তোমারই মঙ্গল।
সুখবর : তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে।

২২. মন্দ

খারাপ : মন্দ লোকের সাথে মিশতে নেই।
অসৎ : মন্দ কাজের পরিণাম ভালো হয় না।
অশুভ : লোকটি মন্দভাগ্য নিয়েই জন্মেছে।
ধীরে ধীরে : জাহাজটি মন্দ মন্দ এগুচ্ছে।
দাম কমা : শেয়ার-বাজারে অধিকাংশ শেয়ারের দামই এখন মন্দা।

২৩. মাথা

মস্তক : তার মাথায় অনেক চুল।
প্রধান : তিনি এ গাঁয়ের মাথা।
প্রণাম : 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।'
সংযোগস্থলে : রাস্তার চৌমাথায় আমাদের বাড়ি।
পরিশ্রমে : শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে।
বুঝতে পারা : অঙ্কটি আমার মাথায় ঢুকছে না।

১০১৬

২৪. মুখ

শরীরের অঙ্গ : তোমার মুখটা ভীষণ সুন্দর।
কথা : 'মুখে মধু অন্তরে বিষ।'
সংযত : মুখ সামলে কথা বলো।
ক্ষমতা : 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।'
প্রবেশপথ : গলির মুখেই আমাদের বাড়ি।
সাহস : মুখ ফুটে কথাটা বলে ফেল।

২৫. মাটি

ধুলা / কাদা : ছেলেটি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে।
শান্ত / সরল : রফিক সাহেব একজন মাটির মানুষ।
বোকামি : শেয়ারের ব্যবসায় নেমে একেবারে মাটি খেয়েছি।
কবর : তাকে কোথায় মাটি দেওয়া হবে আমি জানি না।
নষ্ট : পড়াশুনা না করে জীবনটা মাটি করো না।
নাছোড়বান্দা : সরকারি কাজ পেতে হলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়।

২৬. রাখা

স্থাপন : বইগুলো জায়গামতো রাখো।
গচ্ছিত : টাকাগুলো ব্যাংকে রেখে এসো।
আশ্রয় : আমাকে তোমার পায়ে রাখো প্রভু।
নামকরণ : 'নাম রেখেছি বনলতা।'
সম্মান : ছেলেটি বাবার নাম রেখেছে।
ফেলে আসা : টাকার থলিটি রেখে এসেছি।

২৭. লাগা

স্পর্শ : তোমার শরীরে কি আমার হাত লেগেছে।
থামা : নৌকাটি ঘাটে লেগেছে।
নিযুক্ত : সুমন কাজে লেগে গেছে ।
শুরু : সূর্যগ্রহণ লাগার সময় হয়ে এসেছে।
শত্রুতা : কারও পিছনে লাগা ঠিক না।

২৮. লাল

রং : লাল জামাতে তোমাকে বেশ মানিয়েছে।

জেলখানা : মস্তানি করলে লালদালানে পাঠিয়ে দেব।

বন্ধ হওয়া : অসৎ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে তার ব্যবসায় লালবাতি জ্বলেছে।

ক্রোধ : আমাকে লালচোখ দেখিও না, আমি ভয় পাই না।

পুত্র : "আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"

২৯. লোক

মানুষ : রহিম সাহেব ভালো লোক।

জনসাধারণ : খারাপ কাজ করলে লোকনিন্দা শুনতে হয়।

মৃত্যু : জসিম সাহেব গতকাল পরলোকগমন করেছেন।

মজুর : লোক দিয়ে কাজ করালে নজর রাখতে হয়।

গল্প : শিশুরা লোক-কাহিনি শুনতে ভালোবাসে।

৩০. সারা

সমগ্র / সব : সারা গ্রাম জুড়ে হৈচৈ পড়ে গেছে।

আকুল : শিশুটি মাকে খুঁজে না পেয়ে কেঁদে সারা হলো।

মেরামত : নৌকার ফুটো সারা হয়েছে।

সমাপ্ত : যাক্, এতক্ষণে কাজটি সারা হয়েছে।

হয়রান / ক্লান্ত : রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে সারা হয়েছি।

১০.২ সমার্থক শব্দের প্রয়োগে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে এমন কতকগুলো শব্দ আছে যেগুলো একই অর্থ বহন করে। এ রকম সম-অর্থজ্ঞাপক ভিন্ন শব্দকে **সমার্থকশব্দ, সমার্থশব্দ, বিকল্পশব্দ বা প্রতিশব্দ** বলে।

একই অর্থবহ শব্দের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে। আকৃতি, ব্যঞ্জনা ও গাম্ভীর্যের দিক থেকে এসব শব্দের পার্থক্য থাকে। সমার্থকশব্দ জানা থাকলে লেখার বা বলার সময় একই শব্দ বার-বার ব্যবহার করতে হয় না। ফলে বক্তার বা লেখকের মনের ভাব অনেক সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হয়।

নিচে সমার্থকশব্দ বা প্রতিশব্দের কতিপয় দৃষ্টান্ত বাক্যে প্রয়োগ করে দেখানো হলো :

১. অগ্নি : ঘরে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনজন মারা গেছে।
অনল : 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।'
আগুন : 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।'
বহ্নি : 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।'
বৈশ্বানর : দেখতে দেখতে নিমতলি বস্তিটি বৈশ্বানরের উদরে চলে গেল।

২. অশ্ব : অশ্বখুরে ধুলা উড়িয়ে অশ্বারোহী ছুটে চলে গেল।
ঘোটক : জগা ধোপার ঘোটক তার মতোই দুর্বল আর হাড় জিরজিরে।
ঘোড়া : 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।'
তুরঙ্গ : দুরন্ত গতিতে তুরঙ্গ ছুটে চলেছে।
বাজি : নবাবের আদেশে বাজিপাল বাজি নিয়ে হাজির হলো।

৩. অনুমতি : আমার ঘরে ঢুকতে তোমাকে অনুমতি নিতে হবে না।
আজ্ঞা : আসতে আজ্ঞা হোক।
আদেশ : 'আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।'
নির্দেশ : স্কুলের বেতন পরিশোধ করার জন্য প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের নির্দেশ দিলেন।
হুকুম : ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে পুলিশ আসামিকে কাঠগড়ায় উঠাল।

৪. আকাশ : আকাশে আজ মেঘ নেই।
আসমান : 'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।'
গগন : 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।'
দ্যুলোক : "ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির–
বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর।"
নভ : 'হেথা শ্যামল দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল।'

৫. আকাঙ্ক্ষা : মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই।
ইচ্ছা : ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
কামনা : বাংলাদেশের কল্যাণ কামনা করি।
বাঞ্ছা : ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।
সাধ : 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল সকলই ফুরায়ে যায় মা।'

৬. উত্তম : 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে।'
উপাদেয় : বহুদিন এমন উপাদেয় খাবার খাই নি।
বরেণ্য : শামসুর রাহমান একজন দেশবরেণ্য কবি।
ভালো : বকুল খুব ভালো ছেলে।
শ্রেষ্ঠ : রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি তা বলা কঠিন।

৭. কুল : বরুণের তিন কুলে কেউ নেই।
গোত্র : তোমার গোত্র পরিচয় দাও।
জাত : 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।'
জাতি : 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'
বর্ণ : মানুষে মানুষে বর্ণভেদ থাকা ভালো না।

৮. আলয় : শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যেতে হয়।
গৃহ : 'গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'
ঘর : 'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর।'
ধাম : এ ধরাধাম ছেড়ে একদিন সকলকেই চলে যেতে হবে।
বাড়ি : 'আমার বাড়ি যাইও ভ্রমর বসতে দেব পিঁড়ে।'

৯. চন্দ্র : আজ চন্দ্রগ্রহণ হবে।
চাঁদ : 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'
শশাঙ্ক : শশাঙ্কে কলঙ্করেখা কে দিয়েছে এঁকে?
শশধর : শশধরের পূর্ণ আলোয় পৃথিবী ঝলমল করছে।
শশী : 'একলা শশী জাগিলে আকাশে বাতায়ন খুলে দিয়ো।'

১০. জল : 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'
পয়ঃ : এ শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয়।
পানি : বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন।
বারি : বর্ষার বারিধারায় পৃথিবী সজীব হয়ে উঠেছে।
সলিল : ঝড়ে লঞ্চ ডুবে যাওয়ায় অনেক লোকের সলিল-সমাধি হলো।

১১. অর্থ : জগতে অর্থই সকল অনর্থের মূল।
কড়ি : পার ঘাটেতে এসে দেখি পারের কড়ি নাই।
টাকা : টাকা হলে বাঘের দুধও মেলে।
দৌলত : 'দৌলত পানিতে ফেলে নেকি কর।'
ধন : 'ধনের মানুষ বড় নয়, মনের মানুষ বড়।'

১২. গাঙ : মরা গাঙে বান এসেছে।
তটিনী : তটিনীর তরঙ্গে ভাসালাম এবার ভেলা।
তরঙ্গিণী : ঘর বেঁধেছি শেরি নামক তরঙ্গিণীর তীরে।
নদী : 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে।'
প্রবাহিণী : প্রবাহিণী ছুটে চলে সাগরের পানে।

১৩. জন : জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস।
নর : নর-বানরের যুদ্ধে রাবণ নিহত হয়।
মানব : বিজ্ঞানীরা মানব জাতির কল্যাণে নিরলস গবেষণা করে চলেছেন।
মানুষ : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব।
লোক : 'লোকে বলে বলেরে ঘর-বাড়ি ভালা না আমার।'

১৪. পর্বত : 'পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা।'
গিরি : 'দুর্গম-গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার।'
পাহাড় : 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।'
ভূধর : 'আছ অনল-অনিলে, চির-নভোনীলে ভূধর সলিলে গহনে।'
শৈল : শৈলশৃঙ্গ তুষারে ঢাকা পড়েছে।

১৫. পাখি : 'পাখিসব করে রব, রাতি পোহাইল।'
খগ : 'ময়ূর-ময়ূরী সারী-শুক আদি খগ।'
খেচর : খেচর চলেছে উড়ে নৈঋত কোণে।
পক্ষি : 'উইড়া যায়রে হংসপক্ষি, পইড়া রয়রে ছায়া।'
বিহঙ্গ : 'যাবার সময় হলো বিহঙ্গের।'

১৬. পৃথিবী : পৃথিবীর প্রায় ত্রিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।
জগৎ : এই জগতে আমার আপন বলতে কেউ নেই।
ধরা : 'শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল।'
বসুন্ধরা : 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।'
বিশ্ব : 'বিশ্ব জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র।'
ভুবন : 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

১৭. ফুল : সবাই ফুল পছন্দ করে।
কুসুম : 'কাননে কুসুম-কলি সকলই ফুটিল।'
পুষ্প : 'পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।'
প্রসূন : মরি মরি! এ কী প্রসূন শোভায় সেজেছে আমার গৃহ!

১৮ : বন : বন্যেরা বনে সুন্দর।
অটবি : 'অটবি বায়ুবশে উঠিত সে উছসি।'
অরণ্য : 'দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য, লও এ নগর।'
জঙ্গল : জঙ্গলে বাঘ থাকে।
বনানী : 'স্তব্ধ শরৎ দুপুরে ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে।'

২০২৫

১৯. বাতাস : ঝড়ো বাতাস সব লন্ডভন্ড করে দিল।
পবন : পবনবেগে সে গাড়ি চালিয়ে দিল।
বায় : 'দখিনা বায় মাগিছে বিদায় শাল বীথিকার কাছে।'
বায়ু : ডাক্তার তাকে বায়ু পরিবর্তন করতে বলেছেন।
সমীর : 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।'

২০. বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন এখন অকল্পনীয়।
ক্ষণপ্রভা : ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভায় তাকে এক ঝলক দেখলাম।
তড়িৎ : লোকটি তড়িতাহত হয়ে মারা গেল।
বিজলি : বিজলিবাতিতে পুরো শহরটা যেন চমকাচ্ছে।
বিজুরি : 'বিজুরি ঝলসে যেন মনে।'

২১. রাত : দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছি, সুখের নাগাল পাই না।
নিশি : নিশি ভোর হয়েছে, এবার আঁখি খোল।
নিশীথ : 'নিশীথে যাইও ফুল বনে।'
নিশীথিনী : 'মধুর হলো বিধুর হলো মাধবী নিশীথিনী।'
যামিনী : 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না।'

২২. রাজা : এক দেশে ছিল এক রাজা।
অধিপতি : বাবর ছিলেন ভারতের প্রথম মুঘল অধিপতি।
নৃপতি : আলেকজান্ডারের মতো বীর নৃপতি বিশ্বে বিরল।
ভূপতি : ভূপতিকে দেখে মন্ত্রিবর্গ উঠে দাঁড়ালেন।
সম্রাট : সম্রাট অশোক ছিলেন জগদ্বিখ্যাত বীর।

২৩. সাগর : এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা।
জলধি : উত্তাল জলধি বক্ষে কার ক্ষুদ্র তরীখানি নির্বিঘ্নে চলেছে পারে?
পাথার : অকূল পাথারে আমি ভাসিয়েছি আমার তরী।
সমুদ্র : সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আছে এক রূপকথার দেশ।
সিন্ধু : 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে!'

২৪. সুন্দর : আমাদের দেশটি খুব সুন্দর।
মনোরম : মনোরম ধরণীর তুলনা হয় না।
মনোহর : তার মনোহর চেহারা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়।
রমণীয় : বাহ! কী রমণীয় স্থান!
শোভন : তার পোশাক-আশাক চাল-চলন বেশ শোভন।

২৫. সোনা : সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু।
কনক : 'কনককষিত কান্তি কমনীয় কায়।'
কাঞ্চন : প্রাচীনকালে আমাদের দেশে কাঞ্চন মুদ্রার প্রচলন ছিল।
স্বর্ণ : স্বর্ণের দাম আকাশচুম্বী।
হিরণ : 'হিরণ জরির ওড়না গায়।'

২৬. সূর্য : 'পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল।'
অরুণ : অরুণ কিরণ দেয় মধ্যগগনে।
দিবাকর : মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে দিবাকর।
ভানু : ভানুর কৃপায় শীতের প্রকোপ থেকে উলঙ্গ ছেলেটি রক্ষা পেল।
রবি : 'রবির কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।'

২৭. সর্প : 'সর্প হয়ে দংশন করো, ওঝা হয়ে ঝাড়ো।'
অহি : অহি-নকুলের যুদ্ধ লেগেছে।
আশীবিষ : 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'
নাগ : 'সর্বাঙ্গে দংশিল মোরে নাগ নাগবালা।'
ফণী : প্রবাদ আছে– ফণীর মাথায় মণি থাকে।
সাপ : বাপরে বাপ! কত্তো বড় সাপ!

২৮. মাথা : তার মাথায় অনেক চুল।
মস্তক : মস্তিষ্ক আছে বলেই মস্তকের দাম।
মুণ্ডু : কথায় কথায় সে কেন তোমার মুণ্ডুপাত করে?
মুড়ো : বাবা মাছের মুড়োটি ছেলের পাতে তুলে দিলেন।
শির : 'শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।'

২৯. চোখ : তোমার চোখ দুটি খুব সুন্দর।
আঁখি : 'তোমার আঁখির মতো আকাশের দুটি তারা।'
চক্ষু : চক্ষু থাকতে অন্ধের মতো চলো কেন?
নয়ন : 'নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল।'
নেত্র : তার নেত্র থেকে টপটপ করে অশ্রু পড়তে লাগল।

৩০. কান : কান টানলে মাথা আসে।
কর্ণ : তার কথায় কর্ণপাত করো না।
শ্রুতি : তোমার কথা বাবার কর্ণগোচর হয়নি।
শ্রুতিপথ : চিৎকার করে বলো নয়তো তার শ্রুতিপথে ঢুকবে না।

১০.৩ বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দ আছে যেগুলো পরস্পরের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশক এসব শব্দকে **বিপরীতার্থক শব্দ** বলে।

ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং ভাব-প্রকাশের ব্যাপকতার জন্য এ জাতীয় শব্দ জানা জরুরি। নিচে কয়েকটি বিপরীতার্থক শব্দের নমুনা বাক্য সহযোগে তুলে ধরা হলো।

অধম – উত্তম : তুমি অধম বলেই আমাকে উত্তম হতে হবে।

আয় – ব্যয় : আয় বুঝে ব্যয় কর।

উপকার – অপকার : কারও উপকার করতে না পারো, অপকার করো না।

ঊর্ধ্ব – নিম্ন : "ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল।"

কুৎসিত – সুন্দর : তোমরা তার বাইরের সুন্দর চেহারাটি দেখেছ, ভেতরের কুৎসিত মনটি দেখ নি।

খ্যাতি – অখ্যাতি : সেলিমের খ্যাতির সাথে সাথে কিছু অখ্যাতিও আছে।

গদ্য – পদ্য : আমি গদ্য লিখি, পদ্য লিখতে পারি না।

ঘটন – অঘটন : লেখকরা অঘটন ঘটন পটীয়সী প্রতিভা নিয়ে জন্মান।

চলা – থামা : চলতে চলতে থামলে কেন?

জন্ম – মৃত্যু : জন্ম যখন নিয়েছি, মৃত্যু তো অবধারিত।

টক – মিষ্টি : বেণু টক খেতে পছন্দ করে, মিষ্টি মোটেই খায় না।

ঠান্ডা – গরম : গরমে গলা শুকিয়ে গেছে, একটু ঠান্ডা পানি খাওয়াবে?

ডান – বাম : রাস্তায় চলার সময় বামদিক দিয়ে চলবে, ডানদিক দিয়ে নয়।

ঢাকা – খোলা : খাবার ঢাকা দিয়ে না রেখে খোলা রেখেছ কেন?

তরল – কঠিন : তরল পানি জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়।

দিন – রাত : 'রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।'

ধ্বংস – সৃষ্টি : "আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান, আমি অবসান, নিশাবসান।"

নিরীহ – দুর্দান্ত : তাকে দেখে যতটা নিরীহ ভাবছ, ও ততটাই দুর্দান্ত।

পটু – অপটু : প্রকাশ কাজে যত অপটু, খাওয়ায় ততখানিই পটু।

প্রকাশ – গোপন : সত্যি কখনো গোপন থাকে না, একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই।

১০১৮

ফর্সা – কালো : ফর্সা-কালোয় কিছু যায়-আসে না, আমি একজন সৎ ও বিশ্বাসী বন্ধু চাই।

বড় – ছোট : 'বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।'

ভেজা – শুকনো : তোমার ভেজা মাথাটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে নাও।

যত – তত : 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!'

শূন্য – পূর্ণ : "শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।"

১০.৪ বাগ্‌ধারা

যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নিজস্ব অর্থ অতিক্রম করে অপর কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, সেই শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে বলা হয় বাগ্‌ধারা।

বাগ্‌ধারা বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ। বাগ্‌ধারার মাধ্যমে বক্তার মনের গভীর ভাবকে অল্প কথায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়। এগুলো ভাষাকে শক্তিশালী, ব্যঞ্জনাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। তাই সব ভাষাতেই বাগ্‌ধারার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

নিচে বাগ্‌ধারার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।

অ আ ক খ : (প্রাথমিক জ্ঞান) : তোমার তো দেখছি অ আ ক খ জ্ঞান নেই, চাকরিটা পেলে কীভাবে?

অকালকুষ্মাণ্ড : (অপদার্থ) : অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

আমড়াগাছি করা : (তোষামুদে) : আজকাল আমড়াগাছি না করলে কোনো কাজ হাসিল হয় না।

ইঁদুর কপালে : (মন্দভাগ্য) : এত বড় চাকরি পেয়েও ধরে রাখতে পারলে না, তোমার মতো ইঁদুর কপালে আর কে আছে!

উজানের কই : (সহজলভ্য) : মোবাইল ফোন এখন উজানের কইয়ের মতো, যেখানে সেখানে পাওয়া যায়।

কাপুড়ে বাবু : (বাহ্যিক সভ্য) : আজকাল সত্যিকার অর্থে ভদ্রলোক নেই, সবাই কাপুড়ে বাবু।

খিচুড়ি পাকানো : (জটিল করা) : যা বলবে সহজ করে বল, অযথা খিচুড়ি পাকিয়ো না।

গরজ বড় বালাই : (প্রয়োজনে গুরুত্ব) : পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর, তাই বই কিনতে হবে, গরজ বড় বালাই।

ঘর থাকতে বাবুই ভেজা : (সুযোগ থাকতে কষ্ট) : বাবার অগাধ টাকা, অথচ তুমি কিনা টিউশনি করে চলো, ঘর থাকতে বাবুই ভেজা কেন?

চোখে সাঁতার পানি : (অতিরিক্ত মায়াকান্না) : ব্যাঙের শোকে সাপের চোখে দেখি সাঁতার পানি।

১০১৬

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা : (বৃথা চেষ্টা) : বাবার সামান্য আয়ে সংসারই চলে না, সেখানে আমার প্রাইভেট পড়ার শখ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার মতোই হাস্যকর।

ঝাঁকের কৈ : (একই দলভুক্ত) : ওরা সবাই ঝাঁকের কৈ; একই উদ্দেশ্য নিয়ে চলে।

টাকার গরম : (অর্থের অহংকার) : টাকার গরমে মোহনের পা মাটিতে পড়ে না।

তামার বিষ : (অর্থের কু-প্রভাব) : মেধাবী ছেলেকে তামার বিষে ধরায় সে এবার পরীক্ষায় ফেল করেছে।

তুলসী বনের বাঘ : (ভণ্ড) : রনি দিনে যে বাড়িতে কাজ করে, রাতে সেই বাড়িতেই চুরি করতে যায়; ও হচ্ছে তুলসী বনের বাঘ।

দুধে–ভাতে থাকা : (সুখে থাকা) : 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে–ভাতে।'

নাড়ির টান : (গভীর মমত্ববোধ) : বিদেশে গিয়েও অনেকে দেশের প্রতি নাড়ির টান অনুভব করেন।

পালের গোদা : (দলপতি) : পালের গোদা ধরা পড়েছে, এবার বাকিরাও ধরা পড়বে।

পেটে পেটে বুদ্ধি : (দুষ্টুবুদ্ধি) : মেয়েটির পেটে পেটে এত বুদ্ধি জানতাম না তো!

ব্যাঙের আধুলি : (সামান্য অর্থ) : ব্যাঙের আধুলি সম্বল করে ব্যবসা করা যায় না।

ভিটায় ঘুঘু চরানো : (সর্বস্বান্ত) : তোমার ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।

মাছের মায়ের পুত্রশোক : (মিথ্যা শোক) : গরিবের জন্য বড়লোকের দরদটা মাছের মায়ের পুত্রশোকের মতোই।

শিবরাত্রির সলতে : (একমাত্র সন্তান) : অর্জুন তার বাবা–মায়ের শিবরাত্রির সলতে, তাই সবাই তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখে।

সোনার পাথরবাটি : (অসম্ভব বস্তু) : সাপের পাঁচ পা দেখা আর সোনার পাথরবাটিতে স্যুপ খাওয়া – দুটোই আমার কাছে আষাঢ়ে গল্পের মতো।

হ-য-ব-র-ল : (বিশৃঙ্খল) : বাবার মৃত্যুতে গোছানো সংসারটা কেমন যেন হ-য-ব-র-ল হয়ে গেল।

১০.৫ কর্ম-অনুশীলন

১. বাজারে আগুন লেগেছে। ঝড়ো বাতাস বইছে। পানি দিতে হবে । দমকল-বাহিনীর লোকজন এসেছে। আগুন লকলকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। উজ্জ্বল আগুনে অদ্ভুতভাবে সবকিছু পুড়ছে।

–উপরের অনুচ্ছেদটুকু ভালো করে পড়। অনুচ্ছেদে যেসব শব্দের সমার্থক শব্দ তোমার জানা আছে সেগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ এবং দুটি করে বাক্য বানাও।

২. **মানুষ**–এর মাথা থেকেই সব **নির্দেশ** আসে। **চোখ** দেখে, **কান** শোনে আর **ঠোঁট** নড়ে নড়ে **কথা** বলে। সব **ইচ্ছা**-অনিচ্ছা, **দুঃখ** ও **আনন্দ**-এর **বার্তা** আসে **মাথা** থেকে।

–অনুচ্ছেদটিতে মোটাদাগের যেসব শব্দ আছে, সেগুলোর প্রতিশব্দ লিখে মনের মতো বাক্য তৈরি কর।

৩. **মেঘমুক্ত রাতের আকাশ**। **শীতল** বাতাসে ফুলের **সুগন্ধ**। **নির্মল পবিত্র** এ রাত শুধুই **মিলনের**। **প্রসন্ন** চিত্ত তাই যেন **উন্মুখ** হয়ে কবিতার **মিল** খুঁজে ফেরে।

–উপরের অনুচ্ছেদের মোটা দাগের শব্দগুলোর অর্থসহ বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।

৪. তুমি নিজে এ রকম একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর এবং সেখান থেকে একটি বা দুটি শব্দ বেছে নিয়ে সেটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখিয়ে বাক্য তৈরি কর।

....

নির্মিতি

১. অনুধাবন শক্তি

১.১ অনুধাবন শক্তি পরীক্ষা

২. সারাংশ ও সারমর্ম

৩. ভাব-সম্প্রসারণ

৪. পত্র রচনা : ব্যক্তিগত পত্র, আবেদন পত্র, নিমন্ত্রণ পত্র

৫. প্রবন্ধ রচনা

১. অনুধাবন শক্তি

লিখিত কোনো বিষয় পাঠ করে তার মূলভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারার ক্ষমতাই অনুধাবন দক্ষতা। একটি পাঠে কিছু শব্দ থাকে, কিছু নতুন বিষয় থাকতে পারে যার অর্থ বা ধারণা জানা না থাকলে পাঠটির পূর্ণ ধারণা লাভ সহজ হয় না। তাই একটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে পাঠসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও জানতে এবং বুঝতে হয়। আবার তা কেবল মুখস্থ করলে সেটি বেশিদিন মনে নাও থাকতে পারে। সেই জানা জ্ঞান অন্য কোনো পাঠের সাথে বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এভাবেই অনুধাবন দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়।

১.১ অনুধাবন শক্তি পরীক্ষা :

স্পন্দন, প্রতীতি, প্রান্ত, হিমেল, বর্ণ, প্রাপ্তি শীতের ছুটিতে জগৎপট্টিতে বেড়াতে গিয়েছে। ওরা সবাই এলাকাটি ঘুরে ঘুরে দেখল। ওখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি বাজার আছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষই শিক্ষিত। কৃষিজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ সেখানে বসবাস করে। বেশ কিছু লোক জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ নানা দেশে চাকরি নিয়ে গেছে। এলাকার জনগণ মোটামুটি সচ্ছল। বৈদেশিক অর্থ লেনদেনের জন্য ওখানে বেশ কিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে ফুলের বাগান রয়েছে। জগৎপট্টি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামীণ এলাকা।

কর্ম-অনুশীলন :

ক. 'প্রতীতি' শব্দের অর্থ কী?

খ. কৃষিজীবী কারা?

গ. নানা পেশার মানুষ বলতে কী বুঝায়?

ঘ. জীবিকা বলতে কী বুঝ?

ঙ. আদর্শ গ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

২. সারাংশ ও সারমর্ম

সারাংশ

২.১ কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসে নি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। সে-ভাষায় এ-দেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেক দিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে-ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

সারাংশ : ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে সঙ্গে শব্দের অর্থেরও। হাজার বছরের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এমনি ভাবেই আমাদের বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

২.২ আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আমরা আনন্দকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপ-রস-শব্দ -স্পর্শ গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে উপলব্ধি করি। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায় — নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঙ্গিকের শিল্পকলা।

সারাংশ : মানুষের জীবনীশক্তির প্রকাশ ঘটে আনন্দে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আনন্দকে সে উপলব্ধি করে। সেই আনন্দানুভূতি সবার কাছে জানাতে চায়। তাই ছবি, গান, কবিতা, নাচ, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকলার মাধ্যমে মানুষ তার আনন্দকে প্রকাশ করে। এই আনন্দ ও সুন্দর বোধ মানুষের মনকে তৃপ্ত করে।

২.৩ বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে — 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়তা, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তমঃ, এই তিমির, এই জড়তাই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে।

সারাংশ : বাঙালি প্রেম-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিতে পৃথিবীখ্যাত। কিন্তু আলস্য তাদের দুর্বল করে রেখেছে। অলসতা আর কাজের প্রতি অনীহার জন্য তারা জগতের সবকিছু থেকে পিছিয়ে আছে। এই আলস্য ও কর্ম বিমুখতাকে উপেক্ষা করে বাঙালিকে জেগে উঠতে হবে। তবেই এই বাংলা প্রকৃত অর্থে বাঙালির হবে।

২.৪ একজন মানুষ ভালো কি মন্দ আমরা তা বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। সে ভদ্র কি অভদ্র তাও বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। ব্যবহার ভালো হলে লোকে তাকে ভালো বলে। তাকে পছন্দ করে। ব্যবহার খারাপ হলে লোকে তাকে খারাপ বলে। তাকে অপছন্দ করে। তার সঙ্গে মিশতে চায় না। তার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। তাকে কাছে ডাকতে চায় না। তোমার ব্যবহার দিয়েই তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

সারাংশ : সুন্দর ব্যবহারের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত। মানুষের কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব-কায়দার মধ্যে দিয়েই সুন্দর ব্যবহারের প্রকাশ ঘটে। ভালো ব্যবহার দিয়ে সহজেই অপরের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সুন্দর স্বভাবের মধ্যেই মানুষের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

২.৫ সূর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। শিক্ষার আলো আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে। আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই; শিক্ষার আলো পেয়ে আমাদের ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে। আমরা বড় হতে চাই, বড় হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা সুন্দর করে বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আর সুন্দর করে বাঁচতে হলে চাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগানো চাই। শিক্ষার ফলে আমাদের ভেতর যে শক্তি লুকানো থাকে তা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আমরা মানুষ হয়ে উঠি।

সারাংশ : সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি শিক্ষার আলো মনের অন্ধকার দূর করে দেয়। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে শক্তি লুকানো আছে। শিক্ষা এ শক্তির বিকাশে সাহায্য করে। শিক্ষার ফলে আমরা জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করে নিজের শক্তিকে কাজে লাগাই। যথার্থ মানুষ হয়ে উঠি।

২.৬ নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লববঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল– নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে –
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

সারমর্ম : মা ও মাতৃভূমি সবার কাছে প্রিয়। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি—এর আকাশ-বাতাস, নদী, মাঠ, প্রকৃতি-নিসর্গ, মানুষ সবই আমাদের ভালোবাসার ধন। বাংলার আবহমান অপরূপ রূপে প্রতিটি বাঙালিই মোহ-মুগ্ধ।

২.৭ ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি,
গৃহের প্রতি টান—
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রা রসে ভরা
মাথায় ছোটো বহরে বড় বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন.
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়—তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন—
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধা-হীন।

সারমর্ম : বাঙালি শান্তশিষ্ট, কর্মহীন, আরামপ্রিয় ও অলস জাতি। এ জীবন কারও কাম্য হতে পারে না। তার চেয়ে সাহসী, কর্মী ও চঞ্চলতা মুখর জীবনের অধিকারী হওয়া অনেক বেশি সম্মানের।

৮.৮ এই যে বিটপি-শ্রেণি হেরি সারি সারি—
কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু-হৃদয় যেমন,
ফল-ভরে নত কেহ গুণীর মতন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।

যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

সারমর্ম : গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে নত হয়। তাতে তার গৌরব থাকলেও অহংকার থাকে না। কিন্তু মানুষের অর্থ হলেই অহংকার, অর্থ ফুরিয়ে গেলেই মাথা নিচু হয়। গাছ ফলশূন্য হলেও কিন্তু মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীচ স্বভাবের মানুষের মতো সে কারও কাছে অবনত হয় না।

২.৯ সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ–রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা–কিছু মহান সৃষ্টি চির–কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা–কিছু এল পাপ–তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম : মানবসভ্যতা বিনির্মাণে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের কথা যতটা লেখা হয়েছে, নারীর ততটা হয় নি। নারীকে তার কর্ম–স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন দিন এসেছে সম–অধিকারের। নারী–পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

২.১০ হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।
হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।

সারমর্ম : সূর্যের শক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠে গাছপালা, জীব-জন্তু ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের একটু উত্তাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। সমাজের অবহেলিত ও সুবিধা-বঞ্চিত এসব মানুষের কাছে সূর্যের উষ্ণতা সোনার চেয়েও দামি।

৩. ভাব-সম্প্রসারণ

৩.১ এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ভাব-সম্প্রসারণ : মানুষ স্বভাবতই যত পায়, তত চায়। তার চাওয়ার শেষ নেই। এ জগতে যার যত বেশি আছে, সে তত আরও বেশি চায়। যে লাখ টাকার মালিক, সে কোটিপতি হতে চায়। যার কোটি টাকা আছে, সে হাজার কোটি টাকা পেতে চায়। রাজার বিপুল সম্পদ আছে। তবুও তার নতুন রাজ্য জয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তার আরও সম্পদ চাই। আরও ভোগ, আরও বিলাসিতা প্রয়োজন তার। এই আরও পাওয়ার ইচ্ছা মানুষকে অমানুষ করে তোলে। নিজের মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা গরিবের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তারা তাদের ভোগ-লালসা মেটাতে গরিবের সামান্য সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজেরা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ধনীদের এই লোভে সমাজের সাধারণ মানুষগুলো প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রতারিত; সহায়-সম্বলহীন পথের ফকির। এতে ধনীদের মনে সামান্যতম করুণাও হয় না।

৩.২ করিতে পারি না কাজ
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

ভাব-সম্প্রসারণ : মানুষের জীবন কর্মমুখর। কাজের মাধ্যমেই মানবজীবনের সফলতা আসে। কাজ করতে গেলে ভুল হয় এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ পৃথিবীতে সবাই কর্মী নয়। কিছু অলস-অকর্মণ্য মানুষ আছে, যারা সব সময় অন্যের পেছনে লেগে থাকে। তাদের কাজের খুঁত ধরে, অন্যায় সমালোচনা করে। ফলে অনেক সময় কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে এই সব ভেবে তারা বসে থাকে। যার জন্য কাজ এগোয় না। তাই যারা সমাজে অবদান রাখতে চায় তাদের দ্বিধা করলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচককে উপেক্ষা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়ভীতি সংকোচকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

৩.৩ বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

ভাব-সম্প্রসারণ : মানব-সভ্যতা বিকাশে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সৃষ্টিকর্তা নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে। তাই নারী ও পুরুষ চিরকালের সার্থক সঙ্গী। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারী পুরুষকে জুগিয়েছে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস। আর পুরুষ বীরের মতো সব কাজে অর্জন করেছে সাফল্য। আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত অভিযান সংঘটিত হয়েছে, তার অন্তরালে নারীর ভূমিকাই মুখ্য। সঙ্গত কারণেই নারী ও পুরুষের কার্যক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। তবুও নারী যেমন পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, পুরুষও তেমনি নারীর মুখাপেক্ষী। নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন। নারী ও পুরুষের পারস্পারিক সহযোগিতার মধ্যেই রয়েছে জগতের সমস্ত কল্যাণ। উভয়ের দানে পুষ্ট হয়েছে আমাদের পৃথিবী।

৩.৪ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

ভাব-সম্প্রসারণ : পৃথিবীর সকল দেশেরই জাতীয় জীবনে এমন দু-একটি দিন আসে যা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আমাদের জাতীয় জীবনে এমনি স্মৃতি-বিজড়িত মহিমা-উজ্জ্বল একটি দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। সারা বিশ্বের বাংলা ভাষীদের কাছে এ দিনটি চির-স্মরণীয়। একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস একদিকে আনন্দের, অন্যদিকে বেদনার। পাকিস্তানি স্বৈর-শাসকরা বাঙালির মুখ থেকে বাংলা ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল ১৯৪৮ সালে। বাংলার মানুষ

সে অন্যায় মেনে নেয় নি। বাংলার দামাল ছেলেরা তুমুল বিরোধিতা করে রাজপথে নেমে আসে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। স্বৈরাচারী পাক-সরকার আন্দোলন দমনের জন্য শুরু করে গ্রেফতার, জুলুম, নির্যাতন। এতেও বাংলার দুরন্ত ছেলেদের দমাতে না পেরে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তাদের মিছিলে নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, সালামের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আর সমগ্র বাঙালির চেতনায় চিরস্মরণীয় ও বরণীয় থাকে ভাষা-শহিদদের নাম। তাঁদের অবদান আমরা কোনো দিন ভুলব না ।

৩.৫ জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হয় রে জীবন নদে?

ভাব-সম্প্রসারণ : মানুষ মরণশীল। মানুষ অমর নয়। একদিন সবাইকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুই জীবনের অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুকে ঠেকানোর ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। মানবজীবন নদীর জলের মতো প্রবহমান। নদীর জোয়ার-ভাটার মতো মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন আছে। জাগতিক নিয়মেই জীবন চলে। এটাই প্রকৃতির বিধান। তাই মৃত্যুকে অযথা ভয় পাবার কিছু নেই। বরং এই সত্যকে মেনে নিয়ে মানবজীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে। কর্মগুণে সমাজ-সভ্যতায় নিজের কীর্তির চিহ্ন রেখে যেতে হবে। নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষকে কেউ মনে রাখে না। কিন্তু কৃতী লোকের গৌরব জীবনের সীমা অতিক্রম করে অমরতা ঘোষণা করে। মানুষেরও শারীরিক মৃত্যু হয়। কিন্তু তার জীবনের পুণ্যকর্ম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। নশ্বর মৃত্যুও মানুষের জীবনে তখন অবিনশ্বর হয়ে ওঠে।

৩.৬ বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

ভাব-সম্প্রসারণ : বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবের ইতিহাস অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ইতিহাস। বাঙালি জাতি কারও অধীনতা কোনোদিন মেনে নেয় নি। অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির অবস্থান চিরকালই ছিল বজ্রকঠিন। তাই এখানে বারবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকলে প্রায় দুশো বছর ধরে নিষ্পেষিত হয়েছে এ জাতি। ১৯৪৭-এ সেই জাঁতাকল থেকে এ উপমহাদেশের মানুষ মুক্তি পেলেও বাঙালির মুক্তি মেলে নি। এ বন্ধন বাঙালি মেনেও নেয় নি। ১৯৫২ সালের রক্তঝরা ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মুক্তি-সংগ্রামের দিকে। ১৯৫৮ ও ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক বাংলার দামাল ছেলেদের ওপর গুলি চালায়। গুলি করে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানেও। বারবার বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। তবুও তাদের স্বাধীনতার দাবিকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তানি জান্তা-বাহিনী। তাই তারা ১৯৭১-এ বাঙালির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। তখন বাংলার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তি-সংগ্রামে। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকের রক্তে বাংলার মাটি লাল হয়। অবশেষে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

৩.৭ সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।

ভাব-সম্প্রসারণ : প্রত্যেক মানুষই তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন সত্তা বহন করে। সে একাই তার বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এক্ষেত্রে তার সঙ্গের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভবিষ্যতের সুন্দর বা খারাপের বিষয়টি নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা বা সঙ্গ নির্বাচনের ওপর। যেসব মানুষ উন্নত চরিত্র বা সৎ-স্বভাবের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের স্বভাব-চরিত্রও সুন্দর ও বিকশিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা কুসঙ্গে বা কুসংসর্গে থেকে নিজেদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়েছে, সমাজে তাদের বিপর্যয় অনিবার্য। তাই মানবজীবনে সঙ্গ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতিতেও যেসব বস্তু সুন্দর ও রমণীয়, সেগুলোর সংস্পর্শে যেসব বস্তু থাকে তারাও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। খারাপ বস্তুটি সুন্দর বস্তুটির গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যের কাছে নিজেকে মর্যাদাবান ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, সঙ্গই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করে তোলে। আর এজন্য সঙ্গই হলো সবকিছুর সাফল্য ও বিফলতার চাবিকাঠি।

৩.৮ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

ভাব-সম্প্রসারণ : লোভ মানুষের পরম শত্রু। লোভ মানুষকে অন্ধ করে; তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষ নিজের ভোগের জন্য যখন কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে তাকে লোভ বলে। তখন যা নিজের নয়, যা পাওয়ার অধিকার তার নেই, তা পাওয়ার জন্য মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। সে তার ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলতে চায়। লোভের মোহে সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ সব বিসর্জন দেয়। তার ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পায়। সে পাপের পথে ধাবিত হয়। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে। এভাবে লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে। ডেকে আনে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিণাম। জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য লোভ বর্জন করা উচিত।

৩.৯ জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

ভাব-সম্প্রসারণ : সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণির থেকে মানুষকে আলাদা করেছে তার বিবেক বা জ্ঞান, যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞান বা বিবেক সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই। জ্ঞানবান মানুষ কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। তার বিবেক তাকে খারাপ আচরণ করতে বাধা দেয়। অপরদিকে জ্ঞানহীন মানুষ পশুর মতো নির্বোধ। পশুর যেমন জ্ঞান নেই। সে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না। আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। জ্ঞানহীন ব্যক্তিরও তেমনি কোনো বিবেক নেই। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করতে পারে না।

তাদের জীবনের সঙ্গে পশুর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। জ্ঞানই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়। তাই মানুষকে সব সময় জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত থাকা দরকার।

৩.১০ একতাই বল।

ভাব-সম্প্রসারণ : মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের প্রত্যেকে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে গড়ে উঠেছে মানবসমাজ; মানুষের একতাবোধ। তাই মানবজীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে একতার গভীর সম্পর্ক। মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও জীবনযাপন করতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মানুষের দরকার সংঘবন্ধ শক্তির। একতাবন্ধ জীবনে আছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ঐক্যবন্ধ জাতিকে কোনো শক্তিই পদানত করতে পারে না। একতার কল্যাণ প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনেও। একজনে যে কাজ করতে পারে, দশজনে তার বহুগুণ কাজ করা সম্ভব। এভাবে জাতি একতার গুণে বড় হয় । আজকের বিশ্বে যারা উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত তারা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যে জাতি ঐক্যবন্ধ নয়, সে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তির ক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবন যেমন বিভ্রান্তিকর, তেমনি একতাহীন জাতির ধ্বংস অনিবার্য। ব্যক্তিজীবনের স্বার্থে, জাতীয় জীবনের কল্যাণে এবং মানবজাতির মঙ্গলের জন্য মানুষের একতাবন্ধ থাকা একান্তই অপরিহার্য।

৪. পত্র রচনা

৪.১ ব্যক্তিগত পত্র

ক. মনে কর তোমার নাম দুরন্ত । তোমার বন্ধুর নাম রাহুল। সে খুলনায় থাকে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তার কাছে একটি পত্র লেখ।

পল্লবী,ঢাকা
২৩.০১.২০২২

প্রিয় রাহুল,

আমার শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন হলো তোমার কোনো খবর পাই না। আশা করি ভালো আছ। গতদিন আমাদের স্কুলে 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে একটি সেমিনার হয়ে গেল। সেই সেমিনারেই বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম। তোমাকে সেগুলো জানাতেই এ চিঠি লিখতে বসেছি।

তুমি তো জানো, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। আর গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচুর গাছ কাটছে। বন উজাড় হচ্ছে। তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।

তুমি হয়তো জানো, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মূল ভূ-খণ্ডের কমপক্ষে পঁচিশ ভাগ বন থাকা দরকার। আমাদের দেশে তা নেই। বরং যা আছে তা-ও নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। সভ্যতা ও উন্নয়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কলকারখানা। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বাড়ছে। কলকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়ায় বাতাসে বাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। ক্ষয় হচ্ছে বাতাসের ওজন স্তর। সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিনহাউজ অ্যাফেক্ট। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। দেখা দিচ্ছে নানা রোগ-ব্যাধি। এসবই ঘটছে বাতাসে অক্সিজেনের অভাবের কারণে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগালে বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরে আসবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। তা ছাড়া আমাদের জ্বালানির চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হয় বৃক্ষের মাধ্যমে। কাঠ থেকে আমরা বাড়িঘর এবং আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত করে থাকি। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই আমাদের অধিক হারে বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। বাড়ির চারপাশে, রাস্তার দুপাশে, পতিত জমিতে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরও সচেতন করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৃক্ষ বাঁচলে আমরা বাঁচব।

আজ এই পর্যন্তই। তোমার মা–বাবাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। চিঠি দিও।

ইতি,
তোমার বন্ধু
দুরন্ত

	ডাকটিকিট
	প্রাপক:
প্রেরক:	মো. রাহুল
দুরন্ত	সোনারতরী
৩৫০ পল্লবী, মিরপুর	৩৩ স্যার ইকবাল রোড
ঢাকা।	খুলনা।

খ. তোমার বন্ধু মোহনার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি চিঠি লেখ।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
২৫.০৭.২০২২

সুপ্রিয় মোহনা,

কিছুক্ষণ আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। তুমি লিখেছ তোমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর কথা। আমার কাছে এখনো সব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো! আমি খুবই মর্মাহত। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমার নেই। শুধু জেনো, তোমার এ মর্মবেদনার আমিও সমান অংশীদার।

ছোটবেলায় আমি মাকে হারিয়েছি। মায়ের আদর-ভালোবাসা কাকে বলে জানতাম না। তোমার মা আমার সেই অনুভূতি জাগিয়েছিলেন। তাই তাঁকে আমি মা বলে ডেকেছি। আজ আমি আবার মা-হারা হলাম। মানুষ মরণশীল – এই নির্মম সত্যটা আমাদের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। কাজেই দুঃখ না করে মায়ের আত্মার শান্তির জন্য তিনি যেমনটি ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে আমাদের সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করো। বাবা ও ছোট ভাইয়ের প্রতি খেয়াল রেখো। কয়েক দিন পরে তোমার দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা। নিজের পড়ার কাজে ডুবে থাকলে এ বেদনা হয়তো ধীরে ধীরে প্রশমিত হবে।

পরীক্ষার কারণে আমি তোমার এই দুঃসময়ে কাছে থাকতে পারলাম না, এটাও আমার জন্য খুব কষ্টকর। কায়মনোবাক্যে কামনা করি, তুমি এই প্রতিকূলতা যেন কাটিয়ে উঠতে পারো। আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

তোমার বাবাকে সালাম জানিও। ছোট ভাই সিয়ামের প্রতি রইল আমার অসীম স্নেহ।

ইতি,
তোমার বন্ধু
সুমনা।

	ডাকটিকিট
	প্রাপক:
	মোহনা
প্রেরক:	প্রযত্নে : মো. ফিরদাউস
সুমনা	তারাবনিয়াছড়া
৮০ লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।	কক্সবাজার।

গ. মনে কর, তোমার ছোট ভাই হাসান ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তাকে 'পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ব্যক্তি তথা জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ' এই মর্মে একটি পত্র পাঠাও।

সিদ্ধিরগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
১৭.০৮.২০২২

স্নেহের হাসান,

আমার আদর নিও। গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি ও বাড়ির সবাই ভালো আছ জেনে খুশি হয়েছি।

চিঠিতে জানতে পারলাম আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমার পরীক্ষা শুরু হবে। তোমার পড়াশোনা নিশ্চয়ই ভালোভাবে চলছে? মনোযোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পড়ো এবং বারবার লেখো। নিজের ভুলগুলো নিজেই সংশোধন করো। এতে তোমার হাতের লেখা যেমন সুন্দর হবে, তেমনি লেখায় বানান ভুলও কমে যাবে। ফলে পরীক্ষার খাতায় বেশি নম্বর পাবে।

আজকাল অনেক শিক্ষার্থীই ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকদের কথা শোনে না। বাড়িতেও ঠিকমতো পড়ালেখা করে না। তারা পরীক্ষার হলে গিয়ে নকল করে। কেউ কেউ নকল করে ভালোভাবে পাসও করে যায়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা তাদের হয় না। ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ। আগামীতে তারাই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। তাই পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তাদের নিজেকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। পরীক্ষায় নকল করা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। নকলের মতো দুর্নীতি বা পাপের ওপর ভিত্তি করে জীবনে কখনোই সাফল্য লাভ করা যায় না।

আশা করি, তুমি শিক্ষকদের উপদেশ মতো পড়াশোনার প্রতি গভীর মনঃসংযোগ করবে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে আমাদের পরিবার ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমার কৃতিত্ব ও গৌরব কামনা করি। ভালো থেকো। বাবা ও মাকে আমার সালাম জানিও।

ইতি,
বাঁধন।

ডাকটিকিট

প্রাপক:
হাসান
প্রযত্নে : বুলবুল আহামেদ
গ্রাম : কুলাটিয়া
ডাকঘর : কুলিয়ারচর
জেলা : সুনামগঞ্জ

প্রেরক:
বাঁধন
২১২, সিদ্ধিরগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ।

ঘ. কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে তোমার ছোট বোন বনানীকে একটি চিঠি লেখ।

আহসান রোড
বগুড়া
১৫.০৭.২০২২

প্রিয় বনানী,

আমার স্নেহাশিস নিও। অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ক্লাসে প্রথম হয়েছ জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আরও খুশি হয়েছি তুমি ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে কম্পিউটার শিখছ বলে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আর প্রযুক্তির এ যুগে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে কম্পিউটার। কম্পিউটার ছাড়া আধুনিক জীবন-যাপন কল্পনা করা যায় না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, চিকিৎসা, বিনোদন – সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। তাই কর্মক্ষেত্রেও এখন কম্পিউটার জানা লোকদের অগ্রাধিকার। কম্পিউটার-অভিজ্ঞ লোক বেকার বসে থাকে না। তাই বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যেকেরও উচিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে কম্পিউটার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তুমি ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার ভালোভাবে আয়ত্ত করবে, আমার এই শুভ কামনা রইল।

আজ আর না। মা ও বাবাকে আমার সালাম দিও। তুমি ভালো থেকো।

ইতি,
তোমার ভাইয়া
রনি

প্রেরক:	প্রাপক:	ডাকটিকিট
রনি	ব্রততী বনানী	
১০৪, আহসান রোড	গ্রাম : বাগুডাঙ্গা	
বগুড়া।	ডাকঘর : মূলশ্রী	
জেলা : জামালপুর।	উপজেলা : কালিয়া	
	জেলা : নড়াইল	

৪.২ আবেদন পত্র :

ক. মনে কর তোমার নাম **আবরার জুবায়ের তাজ**। অষ্টম শ্রেণিতে তোমার রোল নম্বর ০১। হঠাৎ করে তোমার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে তোমার লেখাপড়া বন্ধ হতে বসেছে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানি আবেদন পত্র লেখ।

১৪.০৬.২০২২

প্রধান শিক্ষক
এস. এ. উচ্চ বিদ্যালয়, দাড়িয়াপুর।

বিষয় : বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই, আমি আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্র। বিগত তিন বছর যাবৎ আমি এ বিদ্যাপীঠে পড়ালেখা করছি। পরীক্ষায় সব সময়ই আমি প্রথম হয়ে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। অষ্টম শ্রেণিতেও আমার রোল নম্বর ০১। আমার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। পরিবারের ভরণপোষণ ছাড়াও আমাদের তিন ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ চালাতে তিনি হিমশিম খান। তবুও তিনি এ যাবৎ বিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে আমাদের পড়ালেখার খরচ চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করে আমার লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব মহোদয়, আমার আবেদন মানবিকভাবে বিবেচনা করে আমাকে ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যদানে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,
আবরার জুবায়ের তাজ
রোল নং ০১, অষ্টম শ্রেণি
এস. এ. উচ্চ বিদ্যালয়, দাড়িয়াপুর।

খ. শিক্ষাসফরের গুরুত্ব উল্লেখ করে তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন পত্র লেখ।

২০.১২.২০২২

প্রধান শিক্ষক
গজারিয়া শান্তিকুঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর।

বিষয় : শিক্ষাসফরে প্রেরণের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। প্রতি বছর এই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে গিয়ে থাকে। কিন্তু এ বছর এখনো তার কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয় নি। ছাত্রজীবনে শিক্ষাসফরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিক্ষাসফরের ফলে ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয়। যেকোনো ভ্রমণেই দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোভাবে জানার সুযোগ হয়।

আমরা এবার শিক্ষাসফরে ময়মনসিংহে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছি। ময়মনসিংহ প্রাচীন শহর। এর মুক্তাগাছা থানা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে খুব অগ্রগামী ছিল। সেখানে প্রাচীন জমিদার বাড়ি আছে। ময়মনসিংহ শহরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন। সে স্মৃতিচিহ্নও দেখা যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দমোহন কলেজ, জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা ইত্যাদিও আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে। এসব স্থান ও স্থাপনা দর্শন করে আমরা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব।

একদিনের এই সফরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব। আমাদের সঙ্গে দুজন সিনিয়র শিক্ষক যেতে রাজি হয়েছেন। আপনার সম্মতি পেলে শিক্ষাসফরে যাওয়ার দিন ধার্য করে আমরা আমাদের অভিভাবকদের অনুমতি গ্রহণ করব।

অতএব, মহোদয়ের কাছে বিনীত আবেদন, আমাদের শিক্ষাসফরে যাওয়ার সদয় অনুমতি দিয়ে এবং ময়মনসিংহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত,
অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে
সায়মা শতাব্দী
গজারিয়া শান্তিকুঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর।

গ. মনে কর, তোমার বাবা একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। সম্প্রতি তোমার বাবার বদলি হয়েছে। তাই তোমাকেও তার সাথে চলে যেতে হবে। এজন্য তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন কর।

১৫.০৯.২০২২

প্রধান শিক্ষক
কালিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর

বিষয় : বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র। আমার বাবা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সম্প্রতি তাঁকে কক্সবাজার জেলা শহরে বদলি করা হয়েছে। তাই পরিবারের সবার সঙ্গে আমাকেও কক্সবাজার যেতে হচ্ছে। সেখানে নতুন করে ভর্তির জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগের ছাড়পত্র দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক,
তাহসিন আহমেদ
রোল নং – ১২, ৮ম শ্রেণি
কালিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর

ঘ. ধর, তুমি নাকশালা জমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় সখীপুরের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের স্কুলে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানা আবেদন পত্র রচনা কর।

১২.০৯.২০২২

প্রধান শিক্ষক
নাকশালা জমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর

বিষয় : 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী । বেশ কিছুদিন থেকে আমরা স্কুলে বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি বিজ্ঞান ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আর বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হলে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা, তথ্য আদান-প্রদান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করে আমরা নতুন নতুন বিজ্ঞান প্রজেক্ট তৈরিতেও দ্রুত সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হব।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, আমাদের বিদ্যালয়ে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাধিত করবেন।

নিবেদক,

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে
আবদুস সালাম
নাকশালা জমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, সখীপুর

৫.৩ নিমন্ত্রণ পত্র :

ক. তোমার স্কুলে ‘নজরুল জয়ন্তী’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।

সুধী

আগামী ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮/২৫শে মে, ২০২২, বুধবার বিকাল চারটায় বিদ্রোহী ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম জয়ন্তী উপলক্ষে ক উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। সভাপতিত্ব করবেন প্রধান শিক্ষক সরোজ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

বিনীত,

তারিখ : ০৩.০৫.২০২২

ইমরান আহম্মেদ

আহ্বায়ক

নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন পরিষদ

ক উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা।

অনুষ্ঠানসূচি

০৪. ০৫ : অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

০৪. ২০ : পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ

০৪. ৩০ : বিশেষ আলোচনা

০৫. ০০ : সভাপতির ভাষণ

০৫. ৩০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

খ. ধর, তোমার পাড়ায় "আঞ্চলিক মৈত্রী সংঘ" নামে একটি ক্লাব আছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।

প্রিয় সুধী

শুভ 'নববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আগামী ১লা বৈশাখ, ১৪২৯/ ১৪ই এপ্রিল, ২০২১, বৃহস্পতিবার সকাল ০৭টায় আঞ্চলিক মৈত্রী সংঘের পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

বিনীত,

তারিখ : ২৩.০৩.২০২২

অরিন্দম খালেক

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

আঞ্চলিক মৈত্রী সংঘ, সিলেট।

অনুষ্ঠানসূচি

০৬.৩০ : মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি

০৭.৩০ : সংঘ-প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু; এলাকা পরিভ্রমণ

০৯.০০ : সংঘের মিলনায়তনে প্রীতিভোজ

১০.০০ : মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১২.০০ : সমাপ্তি।

২০২৩

৫. প্রবন্ধ রচনা

৫.১ বাংলাদেশের ষড়ঋতু

সূচনা : বাংলাদেশ ঋতু-বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে এক এক ঋতুর এক এক রূপ। ঋতুতে ঋতুতে চলে সাজ বদলের পালা। নতুন নতুন রঙ-রেখায় প্রকৃতি আলপনা আঁকে মাটির বুকে, আকাশের গায়ে, মানুষের মনে। তাই ঋতু বদলের সাথে সাথে এখানে জীবনেরও রঙ বদল হয়। সে কারণেই বুঝি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে–
> তুমি বিচিত্র রূপিণী।

ষড়ঋতুর পরিচয় : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ঋতুর সংখ্যা চারটি হলেও বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। এখানে প্রতি দুই মাস অন্তর একটি নতুন ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। ঋতুগুলো হচ্ছে– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এরা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আর প্রত্যেক ঋতুর আবির্ভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্মকাল : ঋতুচক্রের শুরুতেই আসে গ্রীষ্ম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল। আগুনের মশাল হাতে মাঠ-ঘাট পোড়াতে পোড়াতে গ্রীষ্মের আগমন । তখন আকাশ-বাতাস ধুলায় ধূসরিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির শ্যামল-স্নিগ্ধ রূপ হারিয়ে যায়। খাল-বিল, নদী-নালা শুকিয়ে যায়। অসহ্য গরমে সমস্ত প্রাণিকুল একটু শীতল পানি ও ছায়ার জন্য কাতর হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে কখনো হঠাৎ শুরু হয় কালবৈশাখীর দুরন্ত তাণ্ডব। ভেঙেচুরে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। তবে গ্রীষ্ম শুধু পোড়ায় না, অকৃপণ হাতে দান করে আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, লিচু, তরমুজ ও নারকেলের মতো অমৃত ফল।

বর্ষাকাল : গ্রীষ্মের পরেই মহাসমারোহে বর্ষা আসে। আষাঢ়–শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার বেশে বর্ষার আবির্ভাব। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকৃতি থেমে থেমে শিউরে ওঠে। শুরু হয় মুষলধারায় বৃষ্টি। মাঠ-ঘাট পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতিতে দেখা দেয় মনোরম সজীবতা। জনজীবনে ফিরে আসে প্রশান্তি। কৃষকেরা জমিতে ধান-পাটের বীজ রোপণ করে। গাছে গাছে ফোটে কদম, কেয়া, জুঁই। বর্ষায় পাওয়া যায় আনারস, পেয়ারা আমড়া, কামরাঙ্গা, লটকন প্রভৃতি ফল।

শরৎকাল : বাতাসে শিউলি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে আসে শরৎ। ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। এ সময় সাদা মেঘ নীল আকাশে তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। নদীর তীরে তীরে বসে সাদা কাশফুলের মেলা। বিকেল বেলা মালা গেঁথে উড়ে চলে সাদা বকের সারি। সবুজ ঢেউয়ের দোলায় দুলে ওঠে ধানের খেত। রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে অজস্র তারার মেলা। শাপলার হাসিতে বিলের জল ঝলমল ঝলমল করে ।

তাই তো কবি গেয়েছেন–

আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

শরতের এই অপরূপ রূপের জন্যই শরৎকে বলা হয় ঋতুর রানি ।

হেমন্তকাল : ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসবের আনন্দ নিয়ে আগমন ঘটে হেমন্তের। কার্তিক-অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল। প্রকৃতিতে হেমন্তের রূপ হলুদ। শর্ষে ফুলে ছেয়ে যায় মাঠের বুক। মাঠে মাঠে পাকা ধান। কৃষক ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফসল কাটার কাজে। সোনালি ধানে কৃষকের গোলা ভরে ওঠে, মুখে ফোটে আনন্দের হাসি। শুরু হয় নবান্নের উৎসব। হেমন্ত আসে নীরবে; আবার শীতের কুয়াশার আড়ালে গোপনে হারিয়ে যায়।

শীতকাল : কুয়াশার চাদর গায়ে উত্তরের হাওয়ার সাথে আসে শীত। পৌষ-মাঘ দুই মাস শীতকাল। শীত রিক্ততার ঋতু। কনকনে শীতের দাপটে মানুষ ও প্রকৃতি অসহায় হয়ে পড়ে। তবে রকমারি শাক-সবজি, ফল ও ফুলের সমারোহে বিষণ্ন প্রকৃতি ভরে ওঠে। বাতাসে ভাসে খেজুর রসের ঘ্রাণ। ক্ষীর, পায়েস আর পিঠা-পুলির উৎসবে মাতোয়ারা হয় গ্রামবাংলা।

বসন্তকাল : সবশেষে বসন্ত আসে রাজবেশে। ফাল্গুন–চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল। বসন্ত নিয়ে আসে ফুলের সমারোহ। বাতাসে ভেসে বেড়ায় মৌ মৌ ফুলের সুবাস। গাছে গাছে কোকিল–পাপিয়ার সুমধুর গান। দখিনা বাতাস বুলিয়ে দেয় শীতল পরশ। মানুষের প্রাণে বেজে ওঠে মিলনের সুর। আনন্দে আত্মহারা কবি গেয়ে ওঠেন–

আহা আজি এ বসন্তে
এত ফুল ফোটে, এত বাঁশি বাজে
এত পাখি গায়।

উপসংহার : বাংলাদেশে ষড়ঋতুর এই লীলা অবিরাম চলছে। বিভিন্ন ঋতু প্রকৃতিতে রূপ-রসের বিভিন্ন সম্ভার নিয়ে আসে। তার প্রভাব পড়ে বাংলার মানুষের মনে। বিচিত্র ষড়ঋতুর প্রভাবেই বাংলাদেশের মানুষের মন উদার ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

৫.২ বাংলা নববর্ষ

সূচনা : বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে বিশেষ এক তাৎপর্য বহন করে। গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নববর্ষ নিয়ে আসে নতুন সুর, নতুন উদ্দীপনা। বিগত বছরের সব দুঃখ-বেদনাকে একরাশ হাসি, আনন্দ আর গান দিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে যায় নববর্ষ। প্রাচীনকাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি বাঙালির আনন্দময় উৎসব হিসেবে সুপরিচিত। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির জাতীয় উৎসব।

বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের ইতিহাস : বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রচলনের ইতিহাস রহস্যে ঘেরা। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, বাংলার সুলতান হোসেন শাহ বাংলা সনের প্রবর্তক। কারও কারও মতে, দিল্লির সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রচলন করেন। তাঁর নির্দেশে আমির ফতেউল্লাহ সিরাজি পূর্বে প্রচলিত হিজরি ও চান্দ্র বছরের সমন্বয়ে সৌর বছরের প্রচলন করেন। তবে সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (৯০৩ হিজরি) বাংলা সনের প্রচলন হলেও সম্রাট আকবরের সময় (৯৬৩ হিজরি) থেকেই এটি সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। তখন থেকেই এটি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলা সন আপামর বাঙালি জাতির একান্ত নিজস্ব অব্দ।

নববর্ষের উৎসব : বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকেই নববর্ষ উদ্‌যাপন করে আসছে। তখন বছর শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে। এটি ছিল ফসল কাটার সময়। সরকারি রাজস্ব ও ঋণ আদায়ের এটিই ছিল যথার্থ সময়। পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রচলন হলে বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। আর বাঙালিরা পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। বাংলাদেশে নববর্ষ উদ্‌যাপনে এসেছে নতুন মাত্রা। বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নববর্ষ পালন করা হয়।

পহেলা বৈশাখ : বিগত দিনের সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়ে, পাওয়া না পাওয়ার সব হিসেব চুকিয়ে প্রতি বছর আসে পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। মহাধুমধামে শুরু হয় বর্ষবরণ। সবাই গেয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের এই গান :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা– দূর হয়ে যাক।

বাংলা নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলাই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র এই মেলা। এ মেলায় আবহমান গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি পরিচিতি ফুটে ওঠে। বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগানে মেলার আকাশ–বাতাস মুখরিত হয়। যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি মেলার বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মেলায় পাওয়া যায় মাটির হাঁড়ি, বাসনকোসন, পুতুল, বেত ও বাঁশের তৈরি গৃহস্থালির সামগ্রী, তালপাখা, কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন সামগ্রী, শিশু-কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজ-সজ্জা ইত্যাদি। এছাড়া চিঁড়া, মুড়ি, খৈ, বাতাসাসহ নানা রকমের মিষ্টির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে বৈশাখী মেলায়। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, পহেলা বৈশাখে ভালো খেলে,

নতুন পোশক পরলে সারাটি বছরই তাদের সুখে কাটবে। তাই গ্রামে পহেলা বৈশাখে পান্তা খায় না। যাদের সামর্থ্য আছে তারা নতুন পোশাক পরে।

বাংলা নববর্ষের আরেকটি আকর্ষণ হালখাতা। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের দিন তাদের পুরনো হিসাব-নিকাশ শেষ করে নতুন খাতা খোলেন। এ উপলক্ষে তারা নতুন-পুরনো খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি খাওয়ান। প্রাচীনকাল থেকে এখনো এ অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালিত হয়ে আসছে।

নববর্ষের প্রভাব : আমাদের জীবনে নববর্ষ উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। নববর্ষের দিন ছুটি থাকে। পারিবারিকভাবে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সব কিছুতে আনন্দের ছোঁয়া লাগে। আধুনিক রীতি অনুযায়ী ছোট-বড় সবাই নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় করে। অতীতের লাভ-ক্ষতি ভুলে গিয়ে এদিন সবাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বপ্ন বোনে। নববর্ষ আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। তাই আমাদের জীবনে নববর্ষের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

নববর্ষের তাৎপর্য : বাঙালির নববর্ষের উৎসব নির্মল আনন্দের উৎসধারা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি আজ আমাদের জাতীয় উৎসব। নববর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমরা আমাদের জীবনবাদী ও কল্যাণধর্মী রূপটিই খুঁজে পাই। আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের নববর্ষ উদ্‌যাপনে আনন্দের বিস্তার আছে, কিন্তু কখনো তা পরিমিতিবোধকে ছাড়িয়ে যায় না। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির সারা বছরের আনন্দের পসরা-বাহক।

উপসংহার : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি আসে সগৌরবে – নিজেকে চিনিয়ে, সবাইকে জানিয়ে। আমাদের জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করে পরিবর্তনের একটা বার্তা নিয়ে আসে নববর্ষ। পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে এটি আমাদের জীবনে নতুন হালখাতার প্রবর্তন করে। নববর্ষ আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে; জাতীয় জীবনে স্বকীয় চেতনা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষে মানুষে গড়ে তোলে সম্প্রীতির নিবিড় বন্ধন। তাই বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনে এত আনন্দ ও গৌরবের।

৫.৩ বিজয় দিবস

সূচনা : আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর সবচেয়ে আনন্দ ও গৌরবের একটি দিন। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এই দিনে আমাদের প্রিয় স্বদেশ দখলদারমুক্ত হয়েছিল। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করেছিলাম। এই দিনটি তাই আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। এটি আমাদের 'বিজয় দিবস'।

বিজয় দিবসের ইতিহাস : বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহত্তর। প্রতিটি বিজয়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন। আমাদের বিজয় দিবসের মহান অর্জনের পেছনেও বীর বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের

ইতিহাস রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় প্রথম থেকেই বাঙালিদের মনে পশ্চিমা শোষণ থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছার জাগরণ ঘটে। বাঙালির স্বাধিকার চেতনা ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। বাঙালির স্বাধিকারের ন্যায্য দাবিকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পশ্চিমা সামরিক জান্তাবাহিনী বাঙালি-নিধনের নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাঙালিরা রুখে দাঁড়ায়। গর্জে ওঠে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী-সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ–খ্রিষ্টান– সবাইকে নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশমাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামে। সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি সামরিক জল্লাদরা এ সময় গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে নিরীহ জনসাধারণকে। ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট লুট করে জ্বালিয়ে দেয়। মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করে। প্রাণ বাঁচাতে সহায়-সম্বলহীন এক কোটি মানুষকে আশ্রয় নিতে হয় প্রতিবেশী দেশ ভারতে। তবু বাঙালি দমে যায় নি। পৃথিবী অবাক তাকিয়ে দেখে :

সাবাস বাংলাদেশ! এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় :
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

অবশেষে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে নেয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এদেশের মুক্তিসেনা ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। রক্তাক্ত সংগ্রামের অবসান ঘটে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। সূচিত হয় বাংলাদেশের মহান বিজয়।

বিজয় দিবসের তাৎপর্য : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গৌরবময় বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির জয়যাত্রার শুরু। এই দিনে স্বপরিচয়ে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পাই। এই দিনটির জন্যই সারা বিশ্বে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের মর্যাদা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৬ই ডিসেম্বর তাই আমাদের বিজয় দিবস। প্রতি বছর সবিশেষ মর্যাদা নিয়ে জাতির কাছে হাজির হয় বিজয় দিবস। সব অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিজয় দিবস আমাদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করে।

বিজয় দিবসের উৎসব : ১৬ই ডিসেম্বর ভোরে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা হয়। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মহাসমারোহে বিজয় দিবস পালন করে। ১৫ই ডিসেম্বর রাত থেকেই বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলে। দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজ, ঘর-বাড়ি, দোকানপাট, রিক্সা-গাড়ি ইত্যাদিতে শোভা পায় লাল-সবুজ পতাকা। স্কুল-কলেজ কিংবা রাস্তায় রাস্তায় আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বিজয়ের আনন্দে সব শ্রেণির মানুষ যোগ দেয় এসব অনুষ্ঠানে। কোথাও কোথাও বসে বিজয় মেলা । সরকারি ব্যবস্থাপনায় এদিনটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালন করা হয় । ঢাকার

জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রীগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষ এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন। বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন কাঙালিভোজের আয়োজন করে থাকে। অনেক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিজয় দিবস স্মরণে অনুষ্ঠান করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের আত্মার শান্তি ও দেশের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করা হয়। শহরে সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় বিশেষ আলোকসজ্জার। সমগ্র দেশ জুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে বিজয় দিবস পালিত হয়।

উপসংহার : এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই মহান বিজয় আমাদের অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। এই দিনটি শুধুই আমাদের বিজয়ের দিন নয়, বেদনারও দিন। আমাদের চেতনা জাগরণেরও দিন। যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে আমরা এই গৌরবের অধিকার পেয়েছি, তাঁদের সেই আত্মোৎসর্গের কথা মনে রেখে আমাদেরও সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশ ও জাতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই বিজয় দিবসের মহিমা অর্থবহ হয়ে উঠবে।

৫.৪ ট্রেনে ভ্রমণ

ভূমিকা : ভ্রমণ সর্বদাই আনন্দের। এই আনন্দের সঙ্গে ভ্রমণে যুক্ত হয় জ্ঞানলাভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'

প্রকৃতপক্ষে, ভ্রমণের ফলে মানুষের চিত্ত যেমন প্রফুল্ল হয় ঠিক তেমনি সে অনেক অজানার সন্ধান লাভ করে। আমি একদিন ট্রেন-ভ্রমণে বের হই।

ভ্রমণ কী? : ভ্রমণ হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বেড়ানো বা পর্যটন। মহানবীর বাণীতে আছে, জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সুদূর চীন দেশে যাবার আহ্বান। শ্রীকৃষ্ণও বিশেষ উদ্দেশ্যে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করেছেন। ধর্মীয় মহাপুরুষদের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ বা মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেন। এ সব কিছুর সঙ্গেই আছে আনন্দ আর জ্ঞানের পিপাসা। ভ্রমণ মানবমনে আনন্দ দান করে এবং জ্ঞানের পিপাসা মেটায়। সে কারণে অনেকে এটি কর্তব্যকর্ম বলেও মনে করে।

ভ্রমণের পথসমূহ : সাধারণত স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ এই তিন পথেই ভ্রমণ করা যায়। স্থলপথে বাস ভ্রমণ, সাইকেল ভ্রমণ, মোটর সাইকেল ভ্রমণ, ট্যাক্সি ভ্রমণ ইত্যাদি হতে পারে। তবে পরিসর বড়, দীর্ঘ পথ ক্লান্তিহীনভাবে ভ্রমণের পক্ষে আরামদায়ক রেলভ্রমণ। এতে পথে অনেক স্টেশন থাকায় নানা স্থানের বিচিত্র মানুষের সঙ্গে ক্ষণিক দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটে।

ট্রেনে ভ্রমণের শুরু : পরীক্ষা শেষে তখন আমার স্কুল বন্ধ। ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে মা-বাবার সঙ্গে সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাই। সঙ্গে আমার বোন মাত্রা। উদ্দেশ্য গ্রামের বাড়ি শেরপুরে যাব। আমার বাবা আগেই ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে রেখেছিলেন। আমরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের 'সুলভ' শ্রেণিতে নির্ধারিত আসনে বসলাম। ট্রেনের নাম 'অগ্নিবীণা'। নামটি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বই থেকে নেওয়া। সকাল ঠিক নয়টায় ট্রেন কমলাপুর স্টেশন ছাড়ল।

ট্রেনের ভেতরের অবস্থা : বাবা আমাকে বলেছিলেন: 'সুলভ' শ্রেণিতে উঠলে বিচিত্র ধরনের মানুষের দেখা মেলে। সত্যি তাই দেখলাম। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত নানা ধরনের নারী-পুরুষ সেই সঙ্গে শিশুরা আসনে বসেছে। দুজনের আসনে তিন বা চারজনও কষ্ট করে বসে ছিলেন। একজন বৃদ্ধ আসন পান নি। পাশের আসন থেকে একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসতে দিলেন। এরই মধ্যে চানাচুরওয়ালা 'চানাচুর-বাদাম' বলে মিহি সুর তুলে, আকর্ষণীয় গন্ধ ছড়িয়ে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। একজন চোখের সামনে দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরে তা পাঠ করায় মনোযোগী ছিলেন। ট্রেন ধীরে ধীরে গতিপ্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন স্টেশন : আমি ইতোমধ্যে জানালার ধারে গিয়ে বসেছি। বোন মাত্রা আমার মুখোমুখি বসে। আমার পাশে বাবা আর মাত্রার পাশে মা বসা। দেখলাম ট্রেন তেজগাঁও, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, জয়দেবপুর ইত্যাদি স্টেশনে ক্ষণিক দাঁড়াল। আর স্টেশনে অপেক্ষমাণ মানুষগুলো জলদি উঠে পড়ল ট্রেনে। কারও হাতে ছিল ব্যাগ, কারো কোলে শিশু। কিন্তু সবারই একটাই লক্ষ্য এবং তা হলো ট্রেন। ট্রেনে উঠেই তাদের সব ব্যস্ততা কমে যায়। যে যার আসন খুঁজে নিয়ে সেখানে বসে যান।

ট্রেন থেকে : জানালার ধারে বসে আছি। মনে হচ্ছে মাঠ-ঘাট-গাছপালা দৌড়াচ্ছে। আমার চক্ষু স্থির। কয়েকটা পাখি আকাশে পাখা মেলে আমাদের পাশাপাশি চলে আবার পিছিয়ে পড়ে। মনে হয়, সারা পৃথিবী যেন ঘুরছে, আর আমরা স্থির আছি। জানালার ধারে বাতাসের গতিবেগের কারণে আমার চুল এলোমেলো হয়ে যায়। পাশে তাকিয়ে দেখি বাবা বই হাতে, মা চোখ বুজে আছেন। ট্রেন থেকে শূন্য মাঠ দেখা যায়। কিছুদিন আগেও এখানে সোনালি ধান ছিল। একটি বাড়ি দ্রুত চলে যায়। সেখানে গরু আর মহিষ বাঁধা ছিল। দূরে একটি ইটের বাড়িও চোখে পড়ে। অনেক টিনের ঘরের চালে সূর্য চিক চিক করে। পুকুরে গ্রামের বৌঝিরা কাজে ব্যস্ত– সেটাও চোখে পড়ে। গ্রাম বাংলার রূপ যে এত সুন্দর তা এর আগে আমার চোখে এভাবে আর ধরা পড়ে নি। কবি লিখেছেন–

২০২৫

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে চাই না আর–"

জীবনানন্দের এই ভাষ্য যে কতটা সত্য, যেদিন ট্রেনে ভ্রমণ করলাম, সেদিন বুঝতে পারলাম।

উল্লেখযোগ্য স্থান : ট্রেনে ভ্রমণে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য স্থান ও স্থাপনার মধ্যে পড়ল কমলাপুর রেলস্টেশন। দীর্ঘতম প্লাটফর্ম আছে এই স্টেশনে। তারপর তেজগাঁও আসার আগেই দূর থেকে চোখে পড়ে ঢাকার চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা এফডিসি। ভাওয়ালের জমির ওপর দিয়ে জয়দেবপুরে যাবার আগেই ঢাকা বিমানবন্দর চোখে পড়ে। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। জামালপুরে যমুনা সার কারখানা ছাড়াও পথে নানা স্থান ও স্থাপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সাইনবোর্ডগুলোর ওপর একটু স্থির দৃষ্টি রাখলে স্থান ও স্থাপনাগুলোর নাম ভালোভাবেই পাঠ করা সম্ভব। ট্রেনে ভ্রমণের সময় নানা স্থান ও বিচিত্র স্থাপনাগুলো আমাকে আকৃষ্ট করে।

শেষ স্টেশন: ট্রেন থেকে নামার আগের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা সবাই যে যার ব্যাগ হাতে নিলাম। বাবা বড় ব্যাগগুলো এক সঙ্গে রেখে ট্রেন থামার অপেক্ষা করলেন। আমি আমার একপাটি জুতো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাত্রা বলল : শ্রেষ্ঠা দিদি তোমার জুতো আমার সিটের নিচে এসে গেছে। ট্রেন থামতেই লাল শার্ট পরা কুলিরা এলো। বাবা তাদের হাতে ব্যাগ বুঝিয়ে দিলেন। আমরা নামার চেষ্টায় ব্যস্ত, অনেকে ট্রেনে ওঠার চেষ্টায় মত্ত। এ সময় শৃঙ্খলা দরকার। কিন্তু শৃঙ্খলার বড় অভাব। শেষ পর্যন্ত আমরা জামালপুর স্টেশনে নামলাম। আমাদের সাত ঘণ্টার ট্রেনে ভ্রমণ সমাপ্ত হলো।

উপসংহার : ট্রেনে ভ্রমণ না করলে জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম। বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয়, নানা স্থান অবলোকন, বিভিন্ন স্থাপনা দর্শন ইত্যাদি আমার মনে নানা জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। সুন্দর শ্যামল বাংলাদেশ আমার মনে দেশপ্রেম জাগায় আরও তীব্রভাবে। ট্রেনে ভ্রমণের এই সাতটি ঘণ্টা আমার কাছে যেন সাত জনমের অভিজ্ঞতার খণ্ডরূপ।

৫.৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সূচনা : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে যে শোষণ ও অত্যাচারের শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটে এই যুদ্ধের মাধ্যমে। সমগ্র জাতি দেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের চেতনায় নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল এই যুদ্ধে। ফলে একসাগর রক্তের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালি জাতির কাছে স্বর্ণময় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা জানানোর জন্য সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা : ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচার একটি দোতলা ভবনে প্রতিষ্ঠা করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার আগারগাঁতে শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত। বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত তথ্য, প্রমাণ, বস্তুগত নিদর্শন, রেকর্ডপত্র ও স্মারকচিহ্নসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাধারা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে দেশের কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন স্মারক, তথ্য-প্রমাণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত হয় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে।

জাদুঘরের অবকাঠামো : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশপথের মুখেই রয়েছে 'শিখা চির অম্লান'। তারকা-আকৃতির একটি বেদির ওপর জ্বলছে অনির্বাণ শিখা। তার পেছনে পাথরে খোদাই করা আছে এক দৃঢ় অঙ্গীকার :

সাক্ষী বাংলার রক্তভেজা মাটি
সাক্ষী আকাশের চন্দ্রতারা
ভুলি নাই শহিদদের কোনো স্মৃতি
ভুলব না কিছুই আমরা।

দোতলা বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে ছয়টি গ্যালারি : নিচ তলায় তিনটি ও দোতলায় তিনটি। প্রথম গ্যালারির নিদর্শনগুলো দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। যেমন : সিলেট অঞ্চলে প্রাপ্ত ফসিল, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের মডেল, ভুটান থেকে পাওয়া শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের মূর্তি, বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদের মডেলসহ বিভিন্ন মসজিদের টালির নিদর্শন এবং মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকাজ। এসবের পাশাপাশি এখানে রয়েছে নানা সময়ের মুদ্রা, তালপাতার লিপি ও তুলট কাগজে লেখা মনসামঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষ। দ্বিতীয় পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগ্রামের চিত্র। যেমন : নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেখানে পরাজিত হয়েছিলেন সেই পলাশীর আম্রকাননের মডেল; সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, তিতুমীর, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতি; ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর ফটোগ্রাফ। আরও আছে সিপাহি বিদ্রোহের স্থিরচিত্র, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের শহিদদের চিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার কপি এবং ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের— যাকে আমরা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলি, তার করুণ দৃশ্যের ছবি।

দ্বিতীয় গ্যালারিতে তুলে ধরা হয়েছে পাকিস্তান আমলের ইতিহাস। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৫৪র সাধারণ নির্বাচন, '৫৮র সামরিক শাসন, '৬২র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬র ছয় দফার আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল, ছবি ও স্মারক।

তৃতীয় গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ২৫ শে মার্চ রাতে সংঘটিত গণহত্যা, স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার সংক্রান্ত ছবি ও শরণার্থীদের জীবনচিত্র।

দোতলার তিনটি গ্যালারি সাজানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য, প্রমাণ ও চিত্র দিয়ে। প্রথমটিতে (চতুর্থ গ্যালারি) রয়েছে, পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার বিভিন্ন ছবি, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার এবং সেক্টর কমান্ডারদের নানা তৎপরতার তথ্য ও ছবি। পরেরটিতে (পঞ্চম গ্যালারি) আছে প্রতিরোধের লড়াই, গেরিলাযুদ্ধ, নৌ-কমান্ডো, বিমানবাহিনী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন, রাজাকার-দালালদের ভূমিকা এবং সশস্ত্র যুদ্ধের ছবি, স্মারক ও বিবরণ। সবশেষে (ষষ্ঠ গ্যালারি) রয়েছে গণহত্যা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, বীরশ্রেষ্ঠ, শহিদ বুদ্ধিজীবী, চূড়ান্ত লড়াই এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্মারক, বিবরণ ও ছবি।

প্রতিটি গ্যালারিতে আছেন একজন চৌকস গাইড। তিনি দর্শনার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তাদের কৌতূহল নিবৃত করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চত্বরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানারকম বই, পোস্টার, ক্যাসেট, সিডি, স্মারকসামগ্রী বিক্রির জন্য একটি পুস্তকবিপণি, একটি খাবারের দোকান ও একটি উন্মুক্ত মঞ্চ এবং সামনের অংশে আছে ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি চমৎকার অডিটোরিয়াম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রম : মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জাদুঘর পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য পরিবহন সুবিধাসহ এখানে নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদর্শনীর জন্য একটি গাড়িকে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমন্ত্রিত দর্শকদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। উন্মুক্ত মঞ্চে আয়োজন করা হয়ে থাকে নানা অনুষ্ঠানের। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংগৃহীত স্মারক সংখ্যা প্রায় এগারো হাজার। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বের আরও আটটি দেশের সমভাবাপন্ন জাদুঘরের সঙ্গে মিলে "ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব হিস্টরিক মিউজিয়ামস্ অব কনসান্স" গঠন করেছে ।

উপসংহার : যেকোনো জাদুঘর দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি-স্মারক-দলিলপত্রের একমাত্র সংগ্রহশালা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে পারে, ভুলে না যায়, সে লক্ষ্যেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে।

৫.৬ আমার ছেলেবেলা

আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গীদুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল, কিন্তু সে–কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না– তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর–একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে। আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসি–তামাশা। বাড়িতে নূতন সমাগত জামাতাদিগকে সে বিদ্রূপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত।

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসর্গ হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত– কিন্তু, বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য–সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত–উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে; আর মনে পড়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' ওই ছড়াটা যে শৈশবের মেঘদূত।

তাহার পরে যে–কথাটা মনে পড়িতেছে তাহা স্কুলে যাওয়ার সূচনা। একদিন দেখিলাম, দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য স্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি স্কুলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর–কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না। ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যখন স্কুল–পথের ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি–অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে লাগিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন স্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের ১০১৫

নামধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই। কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী জীবনে আর–কোনদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অকালে ভরতি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে–সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস–রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহির বাড়িতে রাস্তার ধারের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছি। মনে নাই, সত্য কী কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য হঠাৎ 'পুলিশম্যান' 'পুলিশম্যান' করিয়া ডাকিতে লাগিল। পুলিশম্যানের কর্তব্য সম্বন্ধে অন্তত মোটামুটি রকমের একটা ধরণা আমার ছিল। আমি জানিতাম একটা লোককে অপরাধী বলিয়া তাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমির যেমন খাঁজ–কাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমন করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিশ কর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। এরূপ নির্মম শাসনবিধি হইতে নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায়, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম; পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয় আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। মাকে গিয়া আমার আসন্ন বিপদের সংবাদ জানাইলাম; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। কিন্তু, আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা, আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেল কাগজ–মণ্ডিত কোণছেঁড়া–মলাট–ওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো–একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

(–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫.৭ বাংলাদেশের কৃষক

সূচনা : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোক কৃষক। কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ দেশ ভরে ওঠে ফসলের সমারোহে। আমরা পাই ক্ষুধার আহার। কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিদেশে রফতানি করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। বলতে গেলে, কৃষকই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি; আমাদের জাতির প্রাণ। কবির ভাষায় :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।

কৃষকের অতীত ইতিহাস : প্রাচীনকালে এ দেশে জনসংখ্যা ছিল কম, জমি ছিল বেশি। উর্বরা জমিতে প্রচুর ফসল হতো। তখন শতকরা ৮৫ জনই ছিল কৃষক। তাদের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা থাকত মাছে। তাদের জীবন ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ। তারপর এলো বর্গীর অত্যাচার, ফিরিঙ্গি-পর্তুগিজ জলদস্যুদের নির্যাতন, ইংরেজদের খাজনা আদায়ের সূর্যাস্ত আইন, শোষণ ও নিপীড়ন। এলো মন্বন্তর, মহামারী। গ্রাম-বাংলা উজাড় হলো। কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেল। সম্পদশালী কৃষক পরিণত হলো ভূমিহীন চাষিতে। দারিদ্র্য তাকে কোণঠাসা করল। কৃষকের জীবন হয়ে উঠল বেদনাদায়ক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

স্কন্ধে যত তার চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
... শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্ট-ক্লিষ্টপ্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

এভাবেই এককালের সুখী ও সমৃদ্ধ কৃষকের গৌরবময় জীবন-ইতিহাস অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বর্তমান অবস্থা : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু বাঙালি কৃষকের অসহায় ও দরিদ্র জীবনের কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে নি। বাংলার কৃষক আজো শিক্ষাহীন, বস্ত্রহীন, চিকিৎসাহীন জীবন-যাপন করছে। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে, কমেছে কৃষি জমির পরিমাণ। জমির উর্বরতাও গেছে কমে। ফলে বাড়তি মানুষের খাদ্য যোগানোর শক্তি হারিয়েছে এ দেশের কৃষক। পৃথিবী জুড়ে চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত দেশ কৃষকের শক্তি বৃদ্ধি করছে। কিন্তু এ দেশে এখনো মান্ধাতার আমলের চাষাবাদ ব্যবস্থা বহাল আছে। বাংলার কৃষকও ভোঁতা লাঙল আর কঙ্কালসার দুটো বলদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ - কোনো কিছুই মোকাবেলা করার কৌশল ও সামর্থ্য কৃষকের নেই। তবে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগের গুরুত্ব বাড়ছে। সম্প্রতি ব্যাংক, এন জিও, সমবায় সমিতি বা মহাজনের ঋণের টাকায় আর উচ্চ ফলনশীল বীজের সাহায্যে কৃষিতে ফলন বেড়েছে। কিন্তু ক্ষেতের ফসল কৃষকের ঘরে ওঠার আগেই ব্যাংক, এন জিও, সমবায় প্রতিষ্ঠান কিংবা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তাই কৃষকের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এখনো তারা নানা রোগ-শোক, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

কৃষকের উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। দেশীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদানও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষকের উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলার কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আজ সবচেয়ে বেশি দরকার চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন। কৃষক যেন স্বল্পমূল্যে উন্নত

বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক পায় তার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে কৃষককে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করতে হবে। আবার কৃষক তার ফসলের যেন ন্যায্য দাম পায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রাপাতি ব্যবহার করার জন্য তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সারা বছর বিভিন্ন ফসল ও রবিশস্য চাষাবাদের পাশাপাশি কুটিরশিল্পে কৃষকদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে কৃষকের চিত্তবিনোদন ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

উপসংহার: কৃষকই বাংলার কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তিও তারা। তবুও কৃষকরা বহুকাল ধরে অবহেলিত। বিশেষ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা এখনো নিম্নমানের। এ বিষয়ে আমাদের সকলের সচেতন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কৃষক ও কৃষিকে গুরুত্ব দিলেই আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল থাকবে। দেশের দারিদ্র্য দূর হবে। বাংলার ঘরে ঘরে ফুটে উঠবে স্বচ্ছলতার চিত্র। বলা যায়, কৃষকের আত্মার ভেতরই লুকিয়ে আছে আমাদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের বীজ।

৫.৮ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

সূচনা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজ বিজ্ঞান আমাদের কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা মুহূর্তও বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না। এখন যেকোনো ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের অবদান লক্ষণীয়। বলা যায়, এখন বিজ্ঞানই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ন্ত্রক।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। এখন প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে সভ্য-মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে জীবন-ধারণ করছে। এই যে বসে লিখছি – হাতের কলম ও কালি, লেখার কাগজ, এমনকি বসার জায়গাটিতে পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। আমাদের পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে সব জায়গায়ই বিজ্ঞানের অবদান অসীম। শুধু তাই নয়, আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের এই প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজেই আমরা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

শহুরে জীবনে বিজ্ঞান : শহুরে জীবনে মানুষ আর বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শহরে আমাদের ঘুম ভাঙে এলার্মঘড়ির শব্দে। ঘুম থেকে উঠে দিনের শুরু করি টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ দিয়ে। এরপর আছে সংবাদপত্র। তারপর গ্যাস অথবা হিটার কিংবা স্টোভে তাড়াতাড়ি রান্না করে খাই। রিক্সা, অটোরিক্সা, বাস, ট্রেন বা মোটরসাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে পৌঁছাই। সিঁড়ির বদলে লিফটে উঠে অফিসকক্ষে যাই। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির সাহায্যে দূর-দূরান্তে খবর পাঠাই। কম্পিউটারে কাজের বিষয় লিখে

রাখি। ক্লান্ত দেহটাকে আরাম দেওয়ার জন্য এসি কিংবা ইলেকট্রিক পাখার নিচে বসি – এই ভাবেই সারাদিন বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জীবন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দিনের অবসন্নতা দূর করতে মিউজিক প্লেয়ার কিংবা টিভি চালিয়ে মনটাকে সতেজ রাখতে চেষ্টা করি। ছেলে-মেয়েরা কম্পিউটারে তাদের নোট রাখে; কখনো কখনো ভিডিও গেমস্ খেলে। এমনিভাবে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বিজ্ঞানের অবদান অনুভব করি।

গ্রামীণ জীবনে বিজ্ঞান : যোগাযোগ ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদানের জন্য মানুষ আজ দূরকে করেছে নিকট প্রতিবেশী। বাস, রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেল সবই এখন গ্রামীণ জীবনের অংশ। ফলে বিজ্ঞান শহরজীবনকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে গ্রামে। বর্তমানে গ্রামীণ জীবনেও বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন, টর্চ, স্নো, সাবান, পাউডার, আয়না-চিরুনি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, ট্রাক্টর ইত্যাদি এখন গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। শহরের মানুষ যেমন নিজেদের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে বিজ্ঞানকে নিত্যসঙ্গী করেছে, তেমনি গ্রামের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনেও ইলেকট্রিক হিটার, রান্নার গ্যাস, প্রেসার কুকার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাবের অপকারিতা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে। যন্ত্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে গিয়ে মানুষ পরিশ্রম-বিমুখ হয়ে উঠছে। মানসিক পরিশ্রমের তুলনায় শারীরিক পরিশ্রম কম করছে। ফলে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের জীবনে কৃত্রিমতা ঘনীভূত হচ্ছে। মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতার মতো সদ্গুণগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ছে। বিজ্ঞান-নির্ভর যন্ত্রশক্তির ওপর অন্ধ আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে।

উপসংহার : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্তু আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে বিজ্ঞান। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যা কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় তার সবই বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান আজ আমাদের নিত্য সহচর। বিজ্ঞান আমাদের জীবন-যাপনকে করেছে স্বাচ্ছন্দ্যময়। তবে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব শুধু যে কল্যাণ করছে তা নয়,অনেক ক্ষতিও করছে। তাই বিজ্ঞানের অপব্যবহার না করে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে।

৫.৯ ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা : মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে ছাত্রজীবন। এ সময় যেভাবে নিজেকে গড়ে তোলা হয়, সারাজীবন সে রকম ফল পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনকে বলা হয় প্রস্তুতির জীবন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হয় এই ছাত্রজীবনেই। সুতরাং বৃহত্তর জীবনের পটভূমিতে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক।

ছাত্রজীবন : কবি সুনির্মল বসু বলেছেন :

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

মানুষ সারাজীবন কিছু না কিছু শেখে। তাই বৃহত্তর অর্থে মানুষের গোটা জীবনটাই ছাত্রজীবন। কিন্তু ছাত্রজীবন বলতে আমরা বুঝি, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনকে। জীবন গঠনের জন্য মানুষকে একটি বিশেষ সময়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের এই সময়টুকুই মানুষের ছাত্রজীবন।

ছাত্রজীবনের লক্ষ্য : 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ' – অধ্যয়নই হচ্ছে ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা। ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো অধ্যয়ন ও জ্ঞানঅর্জন। ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম ও তপস্যার মাধ্যমে জ্ঞানঅর্জনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার গুরুদায়িত্ব তাদের ওপরই অর্পিত হবে। সে গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য : জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগই একজন ছাত্রের প্রধান কর্তব্য। এজন্য একজন শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আরও অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয়। আর এভাবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে তাকে মানব-চরিত্রের নানাবিধ সৎ-গুণাবলিও অর্জন করতে হয়। যেমন :

১. চরিত্রগঠন : "চরিত্র হচ্ছে মানবজীবনের মুকুট স্বরূপ।" ছাত্রদের একটি প্রধান কাজ হলো চরিত্র গঠন। তাই এ সময় প্রত্যেক ছাত্রেরই সত্যবাদিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, পরোপকার, উদারতা, ধৈর্য, সংযম, দেশপ্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণ আয়ত্ত করতে হবে। সব রকম অসদ্‌গুণ ও বদ-অভ্যাস থেকে দূরে থাকাও একজন ছাত্রের অন্যতম কর্তব্য।

২. নিয়মানুবর্তিতা : শৃঙ্খলা ছাড়া মানবজীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে না। এই শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রজীবনেই অর্জন করতে হয়। এ গুণ অর্জনের ওপর তার ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করে।

৩. সময়ানুবর্তিতা : সময়নিষ্ঠা একটি বড় গুণ। যে মানুষ সময়ের মূল্য দিতে জানে না, সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না। তাই ছাত্রজীবন থেকেই সময়নিষ্ঠার অভ্যাস করতে হবে, সময়ের মূল্য দিতে হবে।

৪. অধ্যবসায় : ছাত্রদের অলসতা ত্যাগ করে পরিশ্রমী হতে হবে। দেখা যায় অনেক মেধাবী ছাত্রও অলসতার কারণে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে ব্যর্থ হয়। আবার অনেক কম মেধার ছাত্র শুধু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা আশাতীত সাফল্য অর্জন করে চমক সৃষ্টি করে। তাই ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. খেলাধুলা ও ব্যায়াম : স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর সুস্থ শরীরে বাস করে সুস্থ মন। শরীর সুস্থ না থাকলে নিয়মিত লেখাপড়া হয় না। তাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য ছাত্রদের নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা খুব জরুরি।

৬. সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ : ছাত্রদের লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য সহ-শিক্ষা কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদিতেও তাকে অংশ নিতে হবে।

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব : ছাত্রজীবনের দায়িত্বের দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা, অপরটি হচ্ছে দেশ ও জাতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। নিজেকে যোগ্য করে তোলার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই কল্যাণ হয়। ছাত্ররা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক; শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই জাতীয় উন্নয়নে সচেতন নাগরিক হিসেবে ছাত্রদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। অতীতে জাতির সংকটকালে ছাত্রসমাজই অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃৎ হয়ে এগিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতেও জাতির সংকটে-সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার কাজে ছাত্রসমাজকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রত্যেক ছাত্রকেই মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা, পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করতে হবে। সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে হবে। শিক্ষক-গুরুজনদের সম্মান করতে হবে। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার সঙ্গে প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার : মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি গঠিত হয় ছাত্রজীবনে। আবার দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ছাত্রদের ওপর। তাই ছাত্রজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঠিকভাবে উপলব্ধি করে তা যথাযথভাবে পালন করা প্রতিটি ছাত্রেরই উচিত। এতে দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং উন্নতি সাধন হয়।

৫.১০ শ্রমের মর্যাদা

সূচনা : কর্মই জীবন। সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীকেই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। ছোট্ট পিঁপড়া থেকে বিশাল হাতি পর্যন্ত সবাইকেই পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ নিজের ভাগ্য বদলেছে এবং বহু বছরের শ্রম ও সাধনা দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বলা যায়, মানুষ ও সভ্যতার যাবতীয় অগ্রগতির মূলে রয়েছে পরিশ্রমের অবদান।

শ্রম কী : শ্রমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মেহনত, দৈহিক খাটুনি। সাধারণত যেকোনো কাজই হলো শ্রম। পরিশ্রম হচ্ছে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। পরিশ্রমের দ্বারাই গড়ে উঠেছে বিশ্ব ও মানব-সভ্যতার বিজয়-স্তম্ভ।

শ্রমের শ্রেণিবিভাগ : শ্রম দুই প্রকার : মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রম। শিক্ষক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, অফিসের কর্মচারী শ্রেণির মানুষ যে ধরনের শ্রম দিয়ে থাকেন সেটিকে বলে মানসিক শ্রম। আবার কৃষক,

শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, মজুর শ্রেণির মানুষের শ্রম হচ্ছে শারীরিক শ্রম। পেশা বা কাজের ধরন অনুসারে এক এক শ্রেণির মানুষের পরিশ্রম এক এক ধরনের হয়। তবে শ্রম শারীরিক বা মানসিক যা-ই হোক না কেন উভয়ের মিলিত পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে মানব-সভ্যতা।

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা : মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। তার এই ভাগ্যকে নির্মাণ করতে হয় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তাই মানবজীবনে পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কর্মবিমুখ অলস মানুষ কোনোদিন উন্নতি লাভ করতে পারে না। পরিশ্রম ছাড়া জীবনের উন্নতি কল্পনামাত্র। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে নিরলস পরিশ্রম দরকার। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষকে পরিশ্রমী হতে হবে। একমাত্র পরিশ্রমই মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে।

শ্রমের মর্যাদা : মানুষের জন্ম স্রষ্টার অধীন, কিন্তু কর্ম মানুষের অধীন। জীবন-ধারণের তাগিদে মানুষ নানা কর্মে নিয়োজিত হয়। কৃষক ফসল ফলায়, তাঁতি কাপড় বোনে, জেলে মাছ ধরে, শিক্ষক ছাত্র পড়ান, ডাক্তার চিকিৎসা করেন, বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন। এঁরা প্রত্যেকেই মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়। আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদায় হয়তো সবাই সমান নয়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই মেধা, মনন, ঘাম ও শ্রমে সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই সকলের শ্রমের প্রতিই আমাদের সমান মর্যাদা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। উন্নত বিশ্বে কোনো কাজকেই তুচ্ছ করা হয় না। সমাজের প্রতিটি লোক নিজের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে করার চেষ্টা করে। তাই চীন, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতির মতো দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। তার ফলে আজো সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা দেশের অধিবাসী হয়েও আমরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করি।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি : সৌভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার দরকার হয়। সব মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে। পরিশ্রমের দ্বারা সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মানুষ কর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, জীবনসংগ্রামে তারই হয়েছে জয়। কর্মের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তি জীবনে সফল সৈনিক হতে পারে। কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ। অন্যদিকে শ্রমশীলতাই মানবজীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনে উন্নতি করতে হলে, জীবনে সুখী হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

উপসংহার : পরিশ্রম শুধু সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রক নয়, সভ্যতা বিকাশেরও সহায়ক। মানব-সভ্যতার উন্নতি-অগ্রগতিতে শ্রমের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও সাধনা আমাদের। তাই কোনো প্রকার শ্রম থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। শ্রমের বিজয়-রথে চড়ে আমাদের উন্নত সভ্যতার সিংহদ্বারে পৌঁছাতে হবে।

৫.১১ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

সূচনা: মানুষের জিজ্ঞাসা অনন্ত এবং কৌতূহলও অসীম। তার এই অনন্ত জিজ্ঞাসা, অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। আর বই সংগৃহীত থাকে পাঠাগারে। পাঠাগার হলো সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির এক বিশাল সংগ্রহশালা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় : "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" পাঠাগারের বইয়ের ভান্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে মানবসভ্যতার শত শত বছরের ইতিহাসের হৃদয়–স্পন্দন।

পাঠাগার কী : পাঠাগার বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন একটি বাড়ি বা ঘর, যেখানে অনেক বই সংগ্রহ ও সংরক্ষিত থাকে। পাঠাগারের শাব্দিক প্রতিশব্দ হচ্ছে পুস্তকাগার, গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়, পাঠাগারের মধ্যে তেমনি মানব সভ্যতার ইতিহাসের উত্থান-পতনের ধ্বনি শোনা যায়। পাঠক এখানে স্পর্শ পায় সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের কল্লোল ধ্বনি, শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতানের সুর। তাই পাঠাগার বা লাইব্রেরি হচ্ছে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন।

পাঠাগারের ইতিহাস : পাঠাগারের ইতিহাস বেশ পুরনো। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের অনেককাল আগে থেকেই পাঠাগারের প্রচলন ছিল। তখন মানুষ তার জ্ঞান সঞ্চিত করে রাখত পাথর, পোড়া মাটি, পাহাড়ের গা, প্যাপিরাস, ভূর্জপত্র, চামড়ায়। আর এগুলো সংরক্ষণ করা হতো লেখকের নিজের বাড়িতে, মন্দির-উপাসনালয়ে এবং রাজকীয় ভবনে। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন গ্রিসে পাঠাগার ছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীন ভারতেও বৌদ্ধ বিহারসহ বিভিন্ন উপাসনালয় যেমন: নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিক্রমশীলায় সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে ওঠে। ভারতে প্রাচীনকালে পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। এছাড়া অ্যাসিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, দামেস্ক, চীন, তিব্বতসহ বহুস্থানে পৃথিবী-বিখ্যাত পাঠাগারের সন্ধান পাওয়া যায়।

পাঠাগারের বিকাশ : আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পাঠাগারের মধ্যে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি, ফ্রান্সের বিবলিওথিক্ নাৎসিওনাল লাইব্রেরি, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে ঢাকায় 'কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই লাইব্রেরির সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শতাধিক পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ঢাকায় বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, খুলনার উমেশচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার স্থাপন করে মানুষের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা আরও বেগবান হয়েছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বাংলাদেশে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের প্রচলন করে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঠাগারের শ্রেণিবিভাগ : বিশ্বে নানা রকম পাঠাগার রয়েছে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত পাঠাগার, পারিবারিক পাঠাগার, সাধারণ পাঠাগার, জাতীয় পাঠাগার উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগারের পরিসর সীমিত। সাধারণ পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, তাই এর পরিসর অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের প্রয়োজনে যে পাঠাগার গড়ে ওঠে সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক পাঠাগার। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবেও পাঠাগার স্থাপন করা হয়ে থাকে। এগুলোই জাতীয় পাঠাগার।

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা : মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি মনের জন্যও খাদ্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের ক্লান্ত, বুভুক্ষু মনকে আনন্দ দেয়। তার জ্ঞান প্রসারে রুচিবোধ জাগ্রত করে। পাঠাগারে সংগৃহীত থাকে নানা মত ও পথের বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় : "লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শ করিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।" সমৃদ্ধ পাঠাগার সব ধরনের পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে; মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে অবদান রাখে। বই ছাড়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। তাই পাঠাগারের মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। জাতীয় জীবনে তাই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ : "গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে সংহতি যা দেশ গড়া কিংবা রক্ষার কাজে রাখে অমূল্য অবদান।" বই পড়ার যে আনন্দ মানুষের মনে, তাকে জাগ্রত করে তুলতে আজ সব ধরনের পাঠাগারের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

উপসংহার : পাঠাগার মানবসভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাসের সংরক্ষণাগার। সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে পাঠাগার একান্ত অপরিহার্য। প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজের মতো দেশের সবখানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

৫.১২ কর্মমুখী শিক্ষা

সূচনা : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জীবন অপূর্ণ। কিন্তু যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিক্ষা অর্থহীন। এ ধরনের শিক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বাড়ে। তাই জীবনভিত্তিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা সেটিই কর্মমুখী শিক্ষা। একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের সহায়ক।

২০২৫

কর্মমুখী শিক্ষা কী : কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রকারভেদ : কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। জীবনমুখী শিক্ষার পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান। তাই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের আলোকে কর্মমুখী শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো – উচ্চতর কর্মমুখী শিক্ষা। এটিতে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী তারা – বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। চাকরির আশায় বসে থাকতে হয় না। আরেকটি হলো – সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা। এর জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দরকার হয় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে পড়ে কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি, কলকারখানার কারিগর, মোটরগাড়ি মেরামত, ঘড়ি-রেডিও-টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ, চামড়ার কাজ, গ্রাফিক্স আর্টস, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, নার্সারি, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোরই বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয় না।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। তাই মানুষকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত, যে শিক্ষা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবন সম্পৃক্ত ও উপার্জনক্ষম কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। কর্মমুখী শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ শিক্ষা ব্যক্তি ও দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কর্মমুখী করে তোলা অতীব প্রয়োজন।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার : কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এর মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পেশাগত কাজের যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়। কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোনো জাতির কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন এবং কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট; লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, গ্রাফিক্স আর্টস্ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই আমাদের দেশে সরকার ও জনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায়

আরও অনেক কর্মমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও মাদ্‌রাসায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বেসিক ট্রেড কোর্স চালু, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প, সমাজকল্যাণ ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত; পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডবল শিফট চালু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদ; উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যাপকভাবে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার।

৫.১৩ অধ্যবসায়

সূচনা : ব্যর্থতা কেউ চায় না। সবাই সাফল্য খোঁজে। কিন্তু কেউই সব কাজে একবারে সফল হয় না। সফলতার জন্য বারবার চেষ্টা করতে হয়। কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার এই চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। অধ্যবসায়ই হচ্ছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

অধ্যবসায় কী : অধ্যবসায় শব্দের আভিধানিক অর্থ অবিরাম সাধনা, ক্রমাগত চেষ্টা। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অবিরাম সাধনা বা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে বলে অধ্যবসায়। ব্যর্থতায় নিরাশ না হয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের সাথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা : ব্যর্থতাই সফলতার প্রথম সোপান। ব্যর্থতা থেকে সাধনার শুরু, আর সফলতার মাধ্যমে তার শেষ। তাই মানবজীবনে সাধনা বা অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায়ী মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। এমনকি অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায় : ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ গড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ মানবজীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে ছাত্র অধ্যবসায়ী, সাফল্য তার হাতের মুঠোয়। অলস ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী হলেও পড়াশোনায় কখনো সফল হতে পারে না। কঠোর অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজেই জয়ী হওয়া যায় না। ছাত্রজীবনেই এই সত্য উপলব্ধি করে নিজেকে অধ্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত উক্তি :

> পারিব না একথাটি বলিও না আর,
> কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার,
> [...]

পার কি না পার কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা : অধ্যবসায় প্রতিভার চেয়ে অনেক বড়। মনীষী ভল্‌তেয়ারের ভাষায়, 'প্রতিভা বলে কোনো কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।' ডালটন বলেছেন, 'লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে; কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু জানি না।' বিজ্ঞানী নিউটনের উক্তি, 'আমার আবিষ্কার প্রতিভা-প্রসূত নয়, বহু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল।' এ থেকেই বোঝা যায়, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রতিভার কোনো মূল্য নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অধ্যবসায় দ্বারাই নিজের কাজকে সুসম্পন্ন করে তোলেন। আবার অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেকে প্রতিভাবান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অধ্যবসায়ের উদাহরণ : পৃথিবীতে যেসব মনীষী সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কার্লাইল অধ্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবার্ট ব্রুস বারবার ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েও যুদ্ধ-জয়ের আশা ও চেষ্টা ত্যাগ করেন নি। ষষ্ঠবার পরাজিত হয়ে তিনি যুদ্ধ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা বারবার কড়িকাঠে সুতা বাঁধবার চেষ্টা করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। এইভাবে ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারে মাকড়সাটি সফল হলো। এই দেখে রবার্ট ব্রুসও সপ্তমবার যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং স্কটল্যান্ডের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। মনীষী কার্লাইল তাঁর লেখা ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন। বন্ধুর বাড়ির কাজের মহিলা সেটিকে বাজে কাগজ ভেবে পুড়িয়ে ফেলেন। কার্লাইল এতে একটুও দমে যান নি। তিনি আবার চেষ্টা করে বইখানা লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ান, আব্রাহাম লিঙ্কন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রমুখ মনীষীর জীবনও অধ্যবসায়ের এক বিরাট সাক্ষ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যবসায়ের গুণেই আজ বিশ্ববিখ্যাত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা বাঙালিমাত্রই তাঁদের জন্য গর্বিত।

উপসংহার : অধ্যবসায় হচ্ছে জীবনসংগ্রামের মূল প্রেরণা। এ সংগ্রামে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যবসায়ী মানুষ জীবনের সব ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, জীবনে সাফল্যের জন্য অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই।

৫.১৪ স্বদেশপ্রেম

সূচনা : মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মস্থানকে ভালোবাসে। জন্মস্থানের আলো-জল-হাওয়া, পশু-পাখি-সবুজ প্রকৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্মস্থানের প্রতিটি ধূলিকণা তার কাছে মনে হয় সোনার চেয়েও দামি। সে উপলব্ধি করে–

মিছা মণি মুক্তা-হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

মানুষের এই উপলব্ধিই হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের সংজ্ঞার্থ : স্বদেশপ্রেম অর্থ হচ্ছে নিজের দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করা। দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা এবং যথার্থ আনুগত্যকে দেশপ্রেম বলে। জন্মভূমির স্বার্থে সর্বস্ব ত্যাগের সাধনাই স্বদেশপ্রেম ।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ : স্বদেশ অর্থ নিজের দেশ। নিজের দেশকে সবাই ভালোবাসে। মাকে যেমন সবাই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে, তেমনি স্বদেশের প্রতিও সবার ভালোবাসা সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে। প্রত্যেক মানুষেরই কথায়, চিন্তায় ও কাজে প্রকাশ পায় স্বদেশের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ। এই বোধ বা চেতনা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। তাই এডউইন আর্নল্ড বলেছিলেন, 'জীবনকে ভালোবাসি সত্যি, কিন্তু দেশের চেয়ে বেশি নয়।' সংস্কৃত শ্লোকে আছে : "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি : দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে জন্ম হয় স্বদেশপ্রেমের। পৃথিবীর সব জায়গার আকাশ, চাঁদ, সূর্য এক হলেও স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে মানুষ নিজের দেশের চাঁদ-সূর্য-আকাশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে। তখন স্বদেশপ্রেমের প্রবল আবেগে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। কেননা সে জানে, দেশের জন্য 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেম : ছাত্ররাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশের উন্নতি ও জাতির আশা পূরণের আশ্রয়স্থল। তাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছাত্রজীবনেই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশকে ভালোবাসার উজ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বিদ্রোহী কবির বাণী :

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।

বাঙালির স্বদেশপ্রেম : পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য দেশপ্রেমিক জন্মেছেন। তাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশেও তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছ। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে বিদেশি শক্তি প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন । ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি স্বৈর-শাসকের হাতে বাংলা-ভাষার জন্য রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকতের আত্মদান দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদান করেছে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, মা-বোনসহ সাধারণ মানুষ। অকুতোভয় শত-সহস্র এ সৈনিকের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এখনো এদেশের লক্ষকোটি জনতা দেশের সামান্য ক্ষতির আশঙ্কায় বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম : স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই একটি অংশ। কেননা বিশ্বের সব মানুষই পৃথিবী নামক এই ভূখণ্ডের অধিবাসী। তাই স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে সকলেরই বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী ও বিশ্ব-মানবতাকে উচ্চকিত করে তুলতে হবে। কারণ বিশ্বজননীর আঁচল-ছায়ায় দেশ জননীর ঠাঁই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজন্যই গেয়েছেন—

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর – তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা॥

উপসংহার : দেশপ্রেম একটি নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ আত্ম-অনুভূতি। কোনো প্রকার লোভ বা লোভের বশবর্তী হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায় না। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। দেশের জন্য তাঁরা সর্বস্ব দান করতে পারেন। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আবহমানকাল ধরে জাতিকে প্রেরণা যোগায়। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। দেশ গড়ার কাজে, দেশের জন্য মঙ্গলজনক কাজে আমাদের সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সর্বোপরি দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। তবেই অর্জিত হবে স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত সার্থকতা।

সমাপ্ত

২০২৩

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম–বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা।
–অতুলপ্রসাদ সেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।